হিন্দুষড়্দর্শন

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী

মূল্য আট টাকা

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
লাইব্রেরীতে
সাদরে অর্পিত

শ্রীগোবিন্দগোপাল
মুখোপাধ্যায়

কাশীধাম
২৬.১০.৭১.



স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

হিন্দুষড়্‌দর্শন

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

তুলসী-বীণা ট্রাস্ট

রাজবাটী। শ্রীরামপুর। হুগলী

প্রথম প্রকাশ : শ্রীশ্রীদশহরা ১৩৩৭
দ্বিতীয় সংস্করণ : জন্মাষ্টমী ১৩৭৮ : ১৩ অগস্ট ১৯৭১

প্রকাশিকা
শ্রীমতী অসীমা গোস্বামী
তুলসী-বীণা ট্রাস্ট -পক্ষে। রাজবাটী শ্রীরামপুর, হুগলী।
মুদ্রক
শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস। ১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট। কলিকাতা ৪

প্রকাশকের প্রতিবেদন

হিন্দুষড়্দর্শন প্রকাশ আমাদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। স্বর্গত তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর বক্তৃতা ও রচনাবলীর একটি সংকলন Footprints of Liberty নামে ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রচেষ্টারূপে প্রকাশিত হয়। আমরা আশা রাখি প্রথম পুস্তকের মতো দ্বিতীয় প্রকাশটিও বিদগ্ধ পাঠকমহলে সমাদৃত হবে।

পূজ্যপাদ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সম্বন্ধে কোনোরকম ভূমিকা লেখবার দুঃসাহস আমাদের নেই। তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ও বহুমুখী প্রতিভার কথা সর্বজনবিদিত। স্বামীজীর একখানা বই আমরা প্রকাশ করব—এ আগ্রহ আমাদের অনেক দিনের। অবশেষে তা সম্ভব হোলো তাঁরই স্নেহ এবং অনুগ্রহে।

'হিন্দুষড়্দর্শন' প্রকাশনে বিভিন্ন দিক্ থেকে আমাদের সাহায্য করেছেন শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগগন দে এবং শ্রীসুবিমল লাহিড়ী। ডাঃ গোবিন্দ-গোপাল মুখোপাধ্যায় অনুগ্রহ করে বইখানি সম্পাদনা ও যত্ন সহকারে প্রুফ-সংশোধনের দায়িত্ব নিয়ে যে উপকার করেছেন শুধুমাত্র একটি কৃতজ্ঞতা স্বীকারেই সে ঋণ কিছুমাত্র পরিশোধ হয় না। মুদ্রণকার্যে শ্রীগোপাল প্রেসের শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার এবং তাঁর সহকর্মীদের নিষ্ঠা সহজেই অনুমেয়। আমরা সকলকেই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

জন্মাষ্টমী ১৩৭৮

সম্পাদক
তুলসী-বীণা ট্রাস্ট

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

১৩৩৭ বঙ্গাব্দ (১৯৩০ খ্রী) 'হিন্দুত্বের দর্শন' নাম দিয়ে কয়টা লিখিত বক্তৃতা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তখনকার দিনে এর চাহিদা মন্দ ছিল না, মনে হয়। অনেক দিন হল বইখানা বাজারে আর মেলে না। মনে হয়, এ রকমের সংক্ষিপ্ত সংকলনের ও সহজভাবে ব্যাখ্যানের দিন আজো চলে যায় নি। এ-সবের প্রয়োজন এবং অবসর আছেই, মনে হয়। তাই, সে পুস্তিকাখানার পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে। সেই আগেকার সংস্করণের মতোই। সংযোগ বিয়োগ কিছু করা হয় নি। বার্ধক্যের দরুন সেরূপ কর্মে ক্ষম ও পটুও নই বর্তমানে। প্রথম সংস্করণের 'নিবেদন'টা এ সংস্করণেও পুনর্নিবেশিত হল। তাতে এ বইয়ের যেটা প্রয়োজন এবং 'অধিকার', সে সম্বন্ধে দু'-এক কথা আছে। এই পুনঃপ্রকাশনকর্মে কল্যাণীয়া স্নেহাস্পদা অসীমা দেবী (স্বর্গীয় তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর বিদুষী কুমারী কন্যা) স-বিশেষ উদ্যোগপরা হয়েছেন। তাঁকে সর্বান্তঃকরণে শুভাশীর্বাদ জানাই। ইতি

জন্মাষ্টমী। ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৭৮
সারস্বত আশ্রম,
পোঃ গড়িয়া, চব্বিশ পরগনা

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

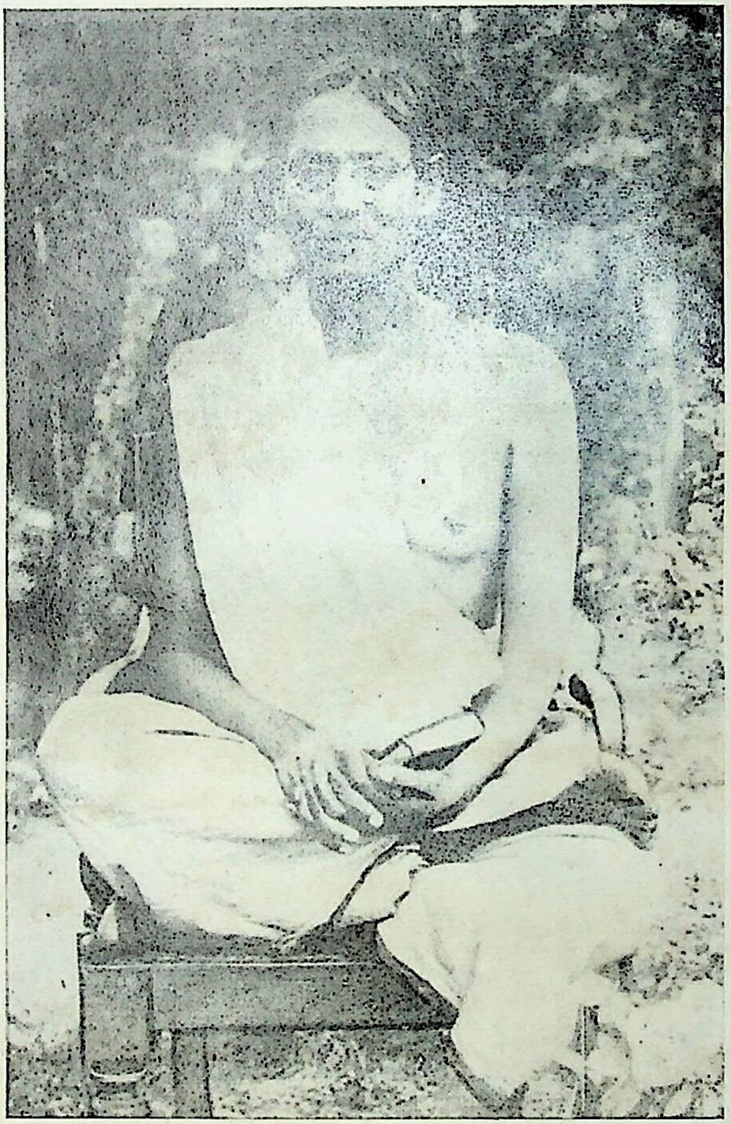
প্রথম সংস্করণের নিবেদন

হিন্দুষড়্দর্শন সম্বন্ধে কয়টা বক্তৃতা প্রকাশিত হইল। নামে ষড়্দর্শন, কিন্তু এর ভিতরে বেদান্তের কথা কিছু বলা হয় নাই বলিলেই চলে। প্রথম ছুটি বক্তৃতায় বেদান্তের জন্য কতকটা জমি তৈরী করা হয়েছে মাত্র। ভবিষ্যতে আর একখানা পুস্তিকায় বেদান্তের কথা সহজ করিয়া বলার ইচ্ছা রহিল। অন্য অন্য দর্শন সম্বন্ধেও মোটামুটি কয়টা কথা এতে আছে। আজকাল অনেকে মোটামুটি কথা কয়টাও শুনিতে চান। যাঁরা ভাল করিয়া জানিতে চান, তাঁদের উচিত হইবে নির্দিষ্ট পদ্ধতিক্রমে দর্শন সম্বন্ধে শাস্ত্রের মূল গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করা। সে রকম অধ্যয়নের ফল এই রকম ধারা বই পড়িয়া আশা করা যায় না। তবে রীতিমত অধ্যয়নের নিমিত্ত একটা আগ্রহ হয়ত এতে জন্মাতে পারে। প্রধানতঃ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পাঠকদিগকে লক্ষ্য করিয়া এ বই লেখা হইয়া থাকিলেও আশা করি, অন্য শ্রেণীর পাঠকেরা এতে উপকার পাইবেন। কথাগুলি যথাসম্ভব সোজা করিয়া বলার চেষ্টা করিয়াছি। হিন্দুদর্শন হিন্দুসাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গৌরব। নিজের স্বাধীন দৃষ্টিতে ইহার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করার ইচ্ছা, আশা করি অনেকেরই হইবে। ইতি

শ্রীশ্রীদশহরা ১৩৩৭
মাধবীকুঞ্জ, চাণ্ডুলি, বর্ধমান।

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

হিন্দুষড়্দর্শন



পূর্বাশ্রমে গ্রন্থকার
অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

এদেশের দর্শন সরাসরিভাবে মানুষের দরকার ও কাজের কথাই আগে তুলিয়াছে। মানুষের জীবনে দরকার রহিয়াছে অনেক কিছুর; কেজো জিনিস রহিয়াছে বা হইতে পারে বিস্তর ;— এ-সবের ভিতরে দর্শন পড়ার, শোনার বা আলোচনা করার স্থান কোথায় এবং কতটুকু ?— এইটাই হইল এদেশের দর্শন-চতুষ্পাঠীর পোড়োদের প্রথম প্রশ্ন এবং আচার্যদের প্রথম উপদেশ। এ প্রশ্নের সদুত্তর না পাইয়া এদেশে কোনও পড়ুয়া এ টোলে আসিয়া দপ্তর পাড়িত না ; এবং উত্তরে খুশী— ছিন্নসংশয়— না হওয়া পর্যন্ত দপ্তর বাঁধিবার হুকুমও শাস্ত্র তাদের দেন নাই। অনেকে অবশ্য "বিষয় কর্মের" উপরোধে আগেই সরিয়া পড়িত, এখনও পড়িতেছে। কিন্তু সেটা শাস্ত্রবিধির অনুসরণ নয়, লঙ্ঘনই হইত। যে অপারগ, বীর্যহীন, সে চিরদিনই অসহিষ্ণু হইবে, মাঝপথ হইতে সরিয়া পড়িবে। জাবাল সত্যকাম অথবা উপকোসলের মতন ব্রহ্মবর্চঃ সকলের ছিল না, এখনও নেই। নচিকেতার মতন ছেলে আর সাবিত্রীর মতন মেয়ে হয়তো কোনো কালেই বেশি জন্মে নাই। দুজনারই সাক্ষাৎ যমের সঙ্গে কারবার। মেয়েটির কথা এই সতীলক্ষ্মীর দেশ তার পুরাণগাথা ও ব্রতকথার মধ্যে চিরদিন জাগিয়ে রেখেছে। আর ছেলেটি সশরীরে যমের ঘরে অতিথি হইয়া আপন নিষ্ঠা ও তেজের দাপটে যমের কাছ হইতে এমন বর আদায় করিয়া লইল, যে-বর ঐহিক প্রেয়ঃ এবং শ্রেয়ের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দিয়া সেই এক পদবীতে জীবকে লইয়া যায়, যেখানে যেটি প্রেয়ঃ সেইটিই আবার শ্রেয়ঃ, এবং যেখানে অল্প, কৃপণ, কুণ্ঠিত বলিয়া কিছু নেই— সবই পূর্ণ, নিরতিশয়,

ভূমা। এই পদবীই জীবের শেষ গন্তব্য ; এইখানে পৌঁছিলেই তার সমস্ত কামনা ও আশার চরিতার্থতা। বলাবাহুল্য, কেবল নচিকেতাঃ বলিয়া নয়, যে কেহ দর্শনের খোঁজ করিয়াছে, তাকে এই সব চাইতে বড়ো, সব চাইতে ভালো, সব চাইতে মধুর, সব চাইতে গোটা বস্তুটিকে চাহিতে হইয়াছে। সে বস্তুটির নাম যাই দেওয়া হোক্ না কেন— সেই বস্তুটি চাওয়া ও খোঁজার রাস্তাটাকেই এদেশে "দর্শন" বলা হইত। এদেশের বেদ এবং বেদের চরমভাগ উপনিষৎগুলিই দর্শনশাস্ত্রের আকর। সে-আকরে যাইয়া খোঁজ লইলে দেখি ঐ নচিকেতাঃ, শ্বেতকেতু, মৈত্রেয়ী, নারদ প্রভৃতি পুণ্যশ্লোকেরা যেটির খোঁজ করিয়াছেন, সেটির খোঁজেই দর্শনশাস্ত্রের জন্ম ; এবং তাঁরা যে রাস্তা ধরিয়া খোঁজ করিয়াছিলেন, গোড়াতে যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত সেই রাস্তাতেই পৌঁছাইয়া দিতে না পারিলে— এক কথায়, উপলব্ধি, সাক্ষাৎকার, realization-এর উপায় না করিয়া দিতে পারিলে— এদেশে দর্শনশাস্ত্র নিজেকে দায়মুক্ত মনে করিতে পারিত না। যেদিন হইতে মনে করিতে শুরু করিয়াছে, সেইদিন হইতেই দর্শনের দৃষ্টিলোপ হইতে চলিয়াছে— শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, সাক্ষাৎকারের ধীরোদাত্ত, প্রসন্ন গম্ভীর বাণী বিবাদের জটলায় এবং "ন্যায়ের কচকচিতে" অস্পষ্ট ও কুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সমীক্ষা, পরীক্ষা, অন্বীক্ষা— এ তিনের কোনোটাই আর সুস্থ নেই, অবিকল নেই, যথার্থ নেই।

তাই বলিয়া "দর্শন" বলিয়া যে শাস্ত্রের ব্যবহার এদেশে চলিয়াছে, সেটা একেবারে বাজে—এমন যেন কেউ মনে না করি। বিচার তর্ক বা মনন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে "তত্ত্বে"র কাছাকাছি আমাদের না লইয়া যাইতে পারিলেও, সেখানে যাবার রাস্তার খানিকটা বটে— উপলব্ধির ভূমিতে উঠিবার একটা সিঁড়ি বটে— যে-সিঁড়ি একেবারে ডিঙাইয়া, মোটে স্পর্শ না করিয়া, কেহই বোধ হয় চরমে পৌঁছিতে পারে না।

তত্ত্বের লক্ষণ দেওয়া শক্ত। লক্ষণ দেওয়া মানে অন্য বা ইতর হইতে বাছিয়া লওয়া ; এক কথায়, একটা গণ্ডী টানিয়া দেওয়া এবং বলা যে, লক্ষিত পদার্থের এলেকা এই গণ্ডীর ভিতর, এর বাহিরে নয়। এখন, "তত্ত্ব" যদি পূর্ণ হয়, ভূমা হয়, সব চাইতে বড়ো ও গোটা বস্তু হয়, তবে তাকে গণ্ডীর ভিতরে পূরি কি করিয়া ? "নেতি নেতি" ভাবে— সে বস্তু ছোটো নয়, অল্প নয়, খণ্ডিত নয়, এই রকমে —কতকটা তাকে দেখানো যাইতে পারে বটে, কিন্তু সে-রকম করিয়া দেখানো আর লক্ষণ দেওয়া এক জিনিস নয়। এইজন্য, এদেশে এবং আর-আর দেশে যাঁরা সত্য সত্যই তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ শ্রেষ্ঠ অনুভূতিটি (Supreme Experience) পাবার যত্ন করিয়াছেন, তাঁরা সকলেই একবাক্যে রায় দিয়াছেন যে, তত্ত্ব, সমগ্রভাবে, লক্ষণের বাহিরে ; কাজে কাজেই মননেরও বাহিরে। কেন না, যে জিনিসের কোনও একটা লক্ষণ বা বিবৃতি দেওয়া যায় না, সে জিনিস নিয়ে বিচার, এমন-কি, বলা-কওয়াও চলে না। অথচ, সে জিনিসের হয়তো সত্যকার অনুভূতি হইতেছে। মূকাস্বাদন— বোবার আস্বাদ দেওয়া— যেমনধারা।

কেবল পূর্ণের অনুভূতিটি নয়, সকল অনুভূতিই, স্বরূপে ও সমগ্র ভাবে, ঐরকম। সেটার অনুভব হইতেছে ; কিন্তু তার সবখানা এবং তার আসল রূপটা বোঝানো যায় না— বলা-কহায় ফুটাইয়া তোলা যায় না। ভাবিয়া দেখিলে কথাটায় গোল নেই। পরে কথাটা আবার আমাদের পাড়িতে হইবে। এইজন্য, তত্ত্বের অনুভূতিটিকে যদি "দর্শন" বলা হয়, তবে মনন বা বিচার সে দর্শন নয়। অনুভূতি আসলে এবং ষোল-আনায়, সব সময়েই "অবাঙ্-মনসগোচর"। ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি উপনিষদে তত্ত্বের এই রহস্য-মূর্তিটিই সব চাইতে খোলসা করিয়া আমাদের দেখানো হইয়াছে। অথচ অনুভূতিই ইহার স্বরূপ বলিয়া এটি স্বপ্রকাশ। অনুভব হইতেছে বলিয়া আর সব প্রকাশিত হইতেছে ; কিন্তু অনুভব নিজে

নিজেই প্রকাশিত ; অনুভবকে আর কে প্রকাশ করিবে ? পঞ্চদশী গোড়াতেই কথা কয়টি সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। তাই মনে রাখিতে হইবে— অনুভূতি "অবাঙ্‌মনসগোচর" হইলেও "অজ্ঞেয়" (unknowable) নয়। অথবা, জানা মানে যদি বিচার করিয়া বুঝিয়া দেখা বলি, তবে, অনুভূতিকে অজ্ঞেয় বলিতেও পারি। কিন্তু তা বলিতে গেলে, "অজ্ঞেয়" কথার এই মানেটা মনে রাখিতে হইবে। নহিলে, পাশ্চাত্য দার্শনিকদের "unknowable"-এর সঙ্গে গোল বাধিয়া যাইবে।

অনুভূতির কাছে বাক্য ও মন (যেটি মনন করে) দুই-ই হার মানিয়া আসে সন্দেহ নাই, কিন্তু তা হইলেও এ দুইএরই দরকার আছে এবং কাজ আছে। যেখানে সত্য সত্যই অনুভূতিটি নাই, সেখানে তার একটা মোটামুটি ধারণা করার যদি দরকার হয়, তবে তুলনা দিয়া, উপমা বা দৃষ্টান্ত দিয়া, কতকটা কাজ হাসিল হইতে পারে। আমি সমুদ্র দেখি নাই। যে দেখিয়াছে, সে আমাকে ঐ নীল আকাশের নমুনা দেখাইয়া কতকটা ধারণা করাইয়া দিতে পারে। বলা বাহুল্য, সে ধারণা মোটামুটি রকমের। নীলাম্বুরাশির নীলিমা আর নীলাকাশের নীলিমা তুলনীয় বটে, কিন্তু এক জিনিস নয়। একটা অপরটার "প্রতীক" হইতে পারে, কিন্তু "স্বরূপ" হইতে পারে না। সাগরের বিশাল, তরঙ্গায়িত নীলিমা ঠিক জানিতে হইলে আমায় প্রতীক ছাড়িয়া স্বরূপ ধরিতে হইবে— সত্য সত্যই সাগরের কূলে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। যতক্ষণ সেটি না হইতেছে, ততক্ষণ সাগর-দেখা লোকে বলিয়া কহিয়া, আকাশের নমুনা দিয়া আমার মনে যে ধারণাটি (conception) ফুটাইয়া দিবে, সেইটি ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই। তাতেই কোনো মতে আমার কাজ চলিয়া যায়। কেবল সাগরের নীলিমা নয়, তার আরও অনেক "ধর্ম" আমি ঐরকম বলা কওয়ার ভিতর দিয়া মোটামুটি কাজ-চালানো-রকমে বুঝিয়া থাকি। আমার নিজের

যা যা অনুভব হইয়াছে বা হইতেছে, সেগুলির সঙ্গে মিলাইয়া ও তুলনা করিয়া এইরকমের "বোঝা" হইয়া থাকে। এ বোঝা সাক্ষাদ্‌ভাবে বোঝা নয়, পরোক্ষভাবে বোঝা। এ বোঝায় সত্যকার সাগর অবশ্য ধরা পড়ে না। এবং যে জনা বুঝিতে চাহিতেছে, সে যদি জাত কূপমণ্ডুক হয়, তবে তার সাগরের বিশালতা বোঝার আস্ফালনে সাগরসন্ধানীর হাস্যসম্বরণ করা দুঃসাধ্যও হইতে পারে।

তার পর মনে রাখিতে হইবে যে, গোটা অনুভবটি লইয়া কাজ চলে না— সেটাকে সেভাবে কোনো কাজে লাগানো যায় না। এই মুহূর্তে আমার যে অনুভব হইতেছে, সেটাকে গোটা করিয়া ধরিতে গেলেই এ কথাটি বুঝিতে পারি। একটা শালকুঞ্জের ছায়ায় বসিয়া লিখিতেছি। এখানে আমার সমগ্র অনুভূতিটি এই কাগজ, কলম আর শালগাছের ছায়া নয়। অবশ্য এইটুক খানিতেই আমার এখন বেশি অভিনিবেশ বা মনোযোগ। কিন্তু এর চারিধারে— এটাকে ঘেরিয়া— আরও অনেক ভাসা ভাসা রকমের— আব্‌ছায়ার মতন— অনুভব হইতেছে। চারি ধারের ঢেউ-খেলানো জমি; একটু দূরে একজন চাষা মোষের লাঙ্গল দিয়া ক্ষেত চষিতেছে; আমার চারিপাশে রবিশস্যের ছোটো ছোটো হলদে ফুলগুলি; দুটো চারিটা পাখির ডাক ও দূরে মানুষের গোলমাল;—এইরকম কত কি অস্পষ্টভাবে আমার এখনকার অনুভূতির ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছে। এগুলিতে আমার মনোযোগ নেই, খেয়াল নেই। আমার দরকার এখন লেখা— কাজেই, কাগজের ওপর গোটা কয়েক হরফ, হাতের স্টাইলো পেনটা, আর মনের কতকগুলো ভাব (ideas)— এই-গুলোই আমার স্পষ্ট চেতনার কেন্দ্রে ("focus"-এ) রহিয়াছে। বাকিগুলো সব অস্পষ্ট— একটা মগ্নচৈতন্যের (sub-consciousn-ess) মধ্যে যেন গা ঢাকা দিয়া রহিয়াছে। অন্ধকার রাত্রিতে জাহাজের সার্চলাইট্ দূরে খানিকটা জায়গার ওপর পড়ে, এবং সেই জায়গাটা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেয়; তার চারিপাশে জিনিসগুলো

অস্পষ্ট আব্‌ছায়ার মতন দেখায়। আমাদের প্রত্যেক অনুভবের বেলা তাই হইতেছে। একটুখানি স্পষ্ট— সেখানটায় অনুভবের চেহারাটা বেশ কাটাছাঁটা। কিন্তু বেশির ভাগ অস্পষ্ট— সেখানটায় সব যেন তাল পাকাইয়া, মাখামাখি জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে। মনঃসংযোগের সার্চলাইটের আলোটি সেখানে ফেলিলে, সেই সব অস্পষ্ট যায়গা স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

কেবল যে বাহিরে যা সব দেখিতেছি, শুনিতেছি, গন্ধ পাইতেছি, আস্বাদ করিতেছি ও স্পর্শ করিতেছি, সেগুলো জড়াইয়াই আমার গোটা অনুভূতি এমন নয়। আমার শরীরের রক্তচলাচলাদির দরুণ, শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি ক্রিয়ার দরুণ সব সময়েই এই "আজব" যন্ত্রটার একটা মোটামুটি "বেদনা" (feeling) হইতেছে। যন্ত্রটার কলকব্‌জা কোনো জায়গায় বিগ্‌ড়াইয়া, অথবা অন্য কারণে, এই মোটামুটি বেদনা একটা বিশেষ আকার ধারণ না করিলে, এ বেদনা প্রায়ই অস্পষ্টভাবে থাকিয়া যায় ; স্পষ্টভাবে থাকা, অস্পষ্টভাবে থাকা, আর মোটেই না থাকা— এ তিনটে এক জিনিস নয়। অস্পষ্ট আর স্পষ্টেরও আবার নানান্ থাক্ আছে। সে যাই হোক— এই শারীরিক অনুভূতি ("somatic feeling") আমাদের সকল অনুভূতির সঙ্গে জড়াইয়া থাকে— সকল অনুভূতির আধারপট (back-ground) রূপে বর্তমান থাকে। তাছাড়া, এদেশের দর্শনে সুখদুঃখাদির মানস অনুভব ("প্রত্যক্ষ" প্রভৃতির লক্ষণ আলাদা করিয়া আমরা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব) মানা হইয়াছে। অনুভব, স্মৃতি, সংশয়, বিপর্যয় আলাদা আলাদা করা হইয়াছে ; অন্তঃকরণ এবং অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলিকে অনেকে অনেক রকমে ভাগ করিয়াছেন ; এ সব আমরা পরে কতক কতক বুঝিতে যত্ন করিব। এখন, লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আমরা এতক্ষণ যেটাকে গোটা অনুভূতি বলিতেছি, সেটা জানার (Experience-এর) কিছুই বাদ দেয় না ; বাহ্য প্রত্যক্ষও তার ভিতরে ; স্মরণ-মনন ;

ভাবনা-চিন্তা ; কল্পনা-জল্পনা ; কামনা-প্রযত্ন ;— সবই তার মধ্যে। এই সব জড়াইয়া সত্যকার যে গোটা অনুভূতি, সেইটাই হইল "এখনকার আমি," অথবা "আমার এখনকার জগৎ"। এই গোটা জিনিসটাকে কোনও একটা নির্দিষ্ট সীমা বা চৌহদ্দির ভিতরে ফেলিয়া বলা যায় না যে— "বস্, এটা এই পর্যন্ত, এর বেশি নয়"। এর মোটে সীমা নেই— একথা বলা যদি না চলে, তবু এটা নিশ্চিত যে, এর সীমা অনির্দিষ্ট (indefinite, undefinable)। এই গোটা বস্তুটি সম্বন্ধে কোনও সংশয় নেই, প্রশ্ন নেই। এ কথাগুলি আমরা পরে ভালো করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব।

এখন, সহজেই বুঝিতেছি যে, এই গোটা অনুভূতিটিকে লইয়া ব্যবহার চলে না ; ইহার টুকরাগুলি লইয়া ব্যবহার চলে। এইক্ষণে পূর্ণ বা সমগ্রভাবে আমার যেটা অনুভূতি, সেটাকে কেমন করিয়া, কোন্ কাজে লাগাইব ? তবে তার মধ্যে যে সব আলাদা আলাদা রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি, ভাবনা চিন্তা প্রভৃতি আছে, তাহাদিগকে লইয়া "ব্যবহার" চলিতে পারে এবং চলিয়া থাকে। মাণ্ডূক্য উপনিষৎ ঐ গোটা বস্তুটিকে (ব্রহ্ম) লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—"অব্যবহার্য"। তাকে আবার "অমেয়" বা "অপ্রমেয়ও" বলিয়াছেন। কেননা, টুকরাগুলির (বিশেষ বিশেষ রূপ, রস, ইত্যাদির) পরিমাণ এবং চৌহদ্দি ঠিক থাকিলেও, গোটা অপরোক্ষ অনুভূতিটির পরিমাণ এবং চৌহদ্দি নির্দিষ্ট নেই। নিজের নিজের অনুভূতির সঙ্গে মিলাইয়া কথাটা বোঝার যত্ন করিতে হইবে। যে জিনিসটার পরিমাণ ঠিক নেই, সে জিনিসটা টুকরা টুকরা হইয়া পরিমাণ পাইতেছে যে বন্দোবস্তের ফলে ; যে জিনিসটার আসলে লক্ষণ নেই, সে জিনিসটা লক্ষণ পাইতেছে যে ব্যবস্থার কল্যাণে— সেইটাকেই শ্রুতি বলিয়াছেন "মায়া" (যেটার দ্বারা "মাপ" হয়)। ব্রহ্ম ও মায়ার ধারণা আমাদের পরে আরও একটু ভালো করিয়া করিতে হইবে। এখানে আমরা কটাক্ষে দেখিয়া লইলাম যে, প্রতিমুহূর্তে, আমাদের প্রত্যেক

অনুভবে ব্রহ্ম ও মায়াকে আমরা পাইয়াছি। এদের ছাড়িয়া একদণ্ড নেই; থাকার যো নেই।

এই বিশ্লেষণের ফলে অনুভূতি বা Experience-কে আমরা দুই রকমে পাইলাম— গোটা (Whole) এবং টুকরা (Section)। অনুভূতি বলিতে আমাদের ভিতরকার জিনিস (মানসিক বৃত্তি) সচরাচর বুঝায় বটে, কিন্তু আমরা এখানে ভিতর ও বাহির (Subjective ও Objective) আলাদা করিয়া দেখিতেছি না। যেটাকে গোটা "আমি" বা আমার "জগৎ" (Universe) বলিতেছি, বিশ্লেষণে, বলা-কহায়, তার একটা ভিতরের দিক্, আর একটা বাহিরের দিক্,—একটা জ্ঞানের দিক্, আর একটা জ্ঞেয়ের দিক্— আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু, আসলে (in itself) সেটা ভিতরও নয়, বাহিরও নয় ("neutral") অথচ, ভিতর ও বাহির—এই ভেদ তার মধ্যে রহিয়াছে বা বিশ্লেষণে ফুটিয়া ওঠে। গোটা জিনিসের মধ্যে "মন" ও "বিষয়", মাতা ও মেয়, দুইটা "পোল"। বিচারে, বিশ্লেষণে "পোল" দুইটা পরস্পর আলাদা হইয়া নিজেদের জাহির করে; নইলে, গোটা জিনিসটা "নিরপেক্ষ" (neutral) হইয়াই থাকে। কথাগুলি, নিজের অনুভূতির পানে তাকাইয়া, বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

এখন, এই গোটা জিনিসটা (ভিতর বাহিরের গোল থামাইবার জন্য এটাকে "Experience" না বলিয়া "Fact" বলাই উচিত) দেখিতেছি অনির্দিষ্ট, অপ্রমেয়, লক্ষণাতীত, অব্যবহার্য। এটাকে, গোটা রাখিয়া, মাপাজোকা চলে না; এর সবটা সম্বন্ধে বলা-কওয়াও চলে না। অথচ, পূর্ণ অনুভূতিই এর স্বরূপ বলিয়া এটা অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় নয়। ইংরাজিতে এক কথায় বলিতে গেলে এটাকে "alogical" (logical নয়) বলা উচিত, "unknowable" বলা উচিত নয়। এই গোটা জিনিসটার ভিতরে নানা বিশেষ ও বৈচিত্র্য (ইংরাজিতে যেটাকে "manifold" বলে, "complex"

বলে) ফুটিয়া রহিয়াছে বা উঠিতেছে। অবশ্য, সময় সময় প্রায় বৈচিত্র্যহীন (featureless, undifferentiated) অনুভবও আমাদের যে না হইয়া থাকে এমন নয়। যোগীদের নির্বিকল্প সমাধির কথা এখানে পাড়িয়া কাজ নেই। সচরাচর যে গোটা অনুভূতি আমাদের হইতেছে, যে "Fact" আমরা পাইতেছি বা হইতেছি, তার মধ্যে অনেক বিশেষ (রূপ, রস প্রভৃতি, ভাবনা-চিন্তা প্রভৃতি) অন্তর্লীন থাকে। এই বিশেষগুলির মধ্যে কোনও একটা বা দুটো আমাদের তখনকার মনোযোগের কেন্দ্রস্থলে (সেই সার্চলাইটের আলোতে) থাকে ; বাকি সব চারিপাশে অল্প-বিস্তর অস্পষ্টভাবে থাকে। "খেয়াল" করিয়া তাদের "আলোতে" হাজির করিতে হয়।

একটা দৃষ্টান্ত— রাত্রিকালে নির্মল আকাশে ধ্রুবতারা আমি দেখিতেছি। তখন ঐ ধ্রুবতারাটাই বিশেষভাবে আমার লক্ষ্যের বিষয় বটে, কিন্তু এটা ঠিক যে, তখন আশেপাশের অনেক তারাও কতকটা অস্পষ্টভাবে আমার চোখে পড়িতেছে। আমার দেখা খানিকটা জমিনের মতন ছড়াইয়া রহিয়াছে ; তার ভিতরে ঐ ধ্রুবতারাটাই সব চাইতে স্পষ্ট ; কেননা, তখন সেইটাই আমি দেখিতে চাই। "কি দেখিতেছ" ?— জিজ্ঞাসা করিলে আমি ঐ ধ্রুবতারার কথাটাই বলি ; বাকিগুলো তখন "অ-কেজো" বলিয়া তাদের আমি আমল দিই না। আবার, একটুখানি খেয়াল করিলেই ধরা পড়িবে যে, তখনকার আমার গোটা অনুভূতির "জগৎ" ঐ ধ্রুবতারা অথবা আর গোটা দুচ্চার তারাতেই গণ্ডীবদ্ধ নয় ; কতক কতক শব্দ, দৈহিক অনুভূতি (organic feeling), কোনো কোনো ভাব-চিন্তা, সেই জগতের কেন্দ্রস্থানে নয়, কিন্তু আড়ালে আব্ডালে ঠাঁই পাইয়াছে। সব কিছু দেখাইয়া দেওয়া যায় না ; যেখানেই সীমা টানিয়া বলি আমার "জগৎ"টা এখন এই পর্যন্ত, দেখি সে জগৎ সে সীমা ছাড়াইয়া রহিয়াছে। আশ্চর্য ব্যাপার!

এখন, গোটা অনুভূতির ভিতরকার বিশেষ বৈচিত্র্যগুলি বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করার বস্তু; পরস্পর তুলনা করার বস্তু; দেশ ও কালের সম্বন্ধে সাজাইবার বস্তু; নিমিত্ত বা কার্যকারণ, অথবা আর নানা সম্বন্ধে আলোচনা করার বস্তু। এগুলি পরিমেয়, তুলনীয়, মননীয়, আলোচ্য; অভীষ্ট অথবা অনভীষ্ট। ধ্রুব-তারাটা বেশি উজ্জ্বল, না আর একটা তারা বেশি উজ্জ্বল; বেশি দূরে, না কম দূরে; বড়ো না ছোটো; কার কটা কুটুম্ব বা সাঙ্গো-পাঙ্গ; কার সঙ্গে কার রাজা-প্রজা সম্বন্ধ, মূল ও শাখা সম্বন্ধ;—ইত্যাকার অনেক জিজ্ঞাসাই মনে হইতে পারে। এবং এই জিজ্ঞাসা ও জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির চেষ্টাকেই মনন বলে। গোটা অনুভূতির জগৎটা গোটা ভাবে মননের বিষয় নয়। অখণ্ড সামগ্রীকে আগে ছেদ দিয়া, গণ্ডী দিয়া পরিচ্ছিন্ন, পরিমিত করিয়া লইলে তবে সেটি মননের বস্তু হয়— "logical" হয়।

পূর্ণ অনুভূতি যে "মন্তব্য" মননের যোগ্য নয়, তা আমরা সাধারণ উদাহরণ নিয়াই যাচাই করিতে চেষ্টা করিলাম। ঐ পূর্ণ, অনুভূতি "এখনকার" জগৎ অথবা "তখনকার" জগৎ, "আমার" জগৎ অথবা "তোমার" অথবা "তার" জগৎ— এভাবেও বিলিবন্দেজ করা যায় না। দেশে, কালে অথবা পাত্রে যেটাকে "বিলি" করিয়া দেওয়া যায়, সেটা পরিমিত, পরিচ্ছিন্ন বস্তু; ভূমা নয়, অখণ্ড নয়, পূর্ণ নয়। কথাটা এখানে সোজাসুজি পাড়িয়া রাখিলাম। বেদান্তের কথায় এ কথাটা ফলাও করিয়া বলিতে হইবে।

পূর্ণ অনুভূতিটি অনুভূতিরই বিষয়। মননের নয়। আমাদের অসাধারণ ব্যবহারে যেগুলি অনুভূতি বলিয়া "চলিতেছে", সেগুলি ব্যবহার বা কারবারের খাতিরে কাটাছাঁটা, মাপা-জোকা। এই-জন্য এদের লইয়া মনন চলিতে পারে এবং চলিয়া থাকে। কিন্তু খেয়াল করিলেই বুঝি যে মনন চলিতেছে গোটা ও আসল (as it is given) অনুভবটা সম্বন্ধে নয়, তার একটা টুকরা সম্বন্ধে, এবং

তার কতকগুলো মোটামুটি "ধর্ম" (abstract relations) সম্বন্ধে। ঠিক ঠিক যেটা দেখিতেছি, শুনিতেছি, আস্বাদ করিতেছি সেটা ঠিক সেভাবে "মূকাস্বাদনবৎ"— মনন ও বলা কওয়ার বাহিরে। তার কতকটা এবং তার কতক কতক "বাদসাদ দেওয়া" ধর্ম মনন ও আলোচনের বস্তু। একেবারে পূর্ণ ও সজীব (Whole and Concrete Reality) চিরদিনই আলোচন ও ভাষণের অতীত রহিয়া গিয়াছে— যেমনধারা গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ যশোদার দড়িতে বাঁধা পড়েন নাই, তেম্‌নিধারা বাস্তব (Fact) কোনো দিনই আমাদের বাক্য ও মনের দড়িতে বাঁধা পড়ে নাই।

গোটা, বাস্তব অনুভূতিটি যে— অনুভূতির বিষয়, সেটাকে যেন আমরা সাধারণ অনুভূতি এবং তার সম্বন্ধী মননের সঙ্গে গুলাইয়া না ফেলি। তাকে "প্রজ্ঞা", "বোধি" অথবা ঐ রকমের একটা কিছু নাম দেওয়া উচিত। ইংরাজিতে "Intuition" কথাটা আজকাল বেশ চলিতেছে। সমগ্রকে, বাস্তবকে (the Whole and the Concrete-কে) ধরার ফন্দি হইতেছে এটি। এ বৃত্তিটি আমাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে রহিয়াছে এবং এর কাজও হইতেছে সন্দেহ নাই; কিন্তু এর পরিপূর্ণ নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার প্রায়ই হইতেছে না। টুকরা লইয়া, "ঝড়তি পড়তি" (abstract) লইয়াই আমাদের আটপৌরে কারবার; তাই "বোধির" নিরাবিল, পরিপূর্ণ প্রকাশ আমাদের ভিতরে অবগুণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। তাই, ব্রহ্ম, আত্মা, মায়া — এসব আমাদের নিত্য "সহচর" হইলেও আমাদের কাছে "অপরিচিত", সব চাইতে "নিকট" হইয়াও "আশ্চর্য"। গীতা ও কঠশ্রুতির সেই— "আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং" ইত্যাদি। ছান্দোগ্য তাই সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন— অহরহ ব্রহ্মপুরে যাতায়াত করিয়াও আমরা তার খোঁজ রাখি না। যেমনধারা কোনো ব্যক্তি মাটিতে পোঁতা গুপ্তধনের উপর দিয়া নিত্য যাতায়াত করিয়াও তার হদিশ পায় না। যে-ভিখারী সেই ভিখারীই রহিয়া

যায়! পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন— অনেক পড়ুয়ার সঙ্গে নিজের ছেলেটিও পড়িতেছে; সকলের গলার আওয়াজের সঙ্গে ছেলের গলার আওয়াজও শোনা যাইতেছে। অথচ, বিশেষভাবে শোনা যাইতেছে না; সেইরকম "সংবিৎ" বা চৈতন্যেরও "ভান" হইয়াও "অভান" হইতেছে। এইজন্য "বোধি" বা ইনটুইসনের শোধন ও সাধন আবশ্যক। তাই ছান্দোগ্যে নারদ-সনৎকুমার সংবাদে "ভূমা" বস্তুটিকে উপলব্ধির জন্য "মৃদিতকষায়" হইয়া "সত্ত্বশুদ্ধি" লাভের দরকারের কথা বলা হইয়াছে।

বোধি যতই পরিষ্কার ও পূর্ণ হইবে, অনুভূতি ততই গোটা ও বাস্তব আকারে তাতে প্রতিভাত হইবে। বোধির নিরতিশয়, চরম শুদ্ধ ও পূর্ণ অবস্থায় যে পূর্ণ অনুভূতি, তাহাই ভূমা, তাহাই অদিতি, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই তত্ত্ব। আমাদের সাধারণ অনুভূতিতে ব্রহ্ম বা অদিতি পূরাপূরিই ধরা পড়িতেছেন না; অথচ এর মধ্যে মোটেই তিনি প্রকাশ নেই, একথা বলিলেও খাঁটি কথা বলা হয় না। এই রহস্যময় ব্যাপারটিকে প্রাচীনেরা নানা রকমের প্রহেলিকার ভাষায় আমাদের শুনাইয়াছেন। কখনও বা বলিয়াছেন, ব্রহ্ম অসীম বস্তু হইয়াও দহরগুহার মধ্যে লুকাইয়াছেন; কখনও বা বলিতেছেন, স্বপ্রকাশ সংবিদের ভান হইয়াও ভান হইতেছে না। আবার কোথাও বা শুনি, তিনি নিখিল সৃষ্টি করিয়া নিখিলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। এ সকল কথা শুনিলে আমরা অবাক হইয়া যাই। কিন্তু আগে আমরা যে ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিলাম, সে ভাবে বুঝিতে পারিলে, এই সকল হেঁয়ালীর কথা খাঁটি সত্য কথা হইয়া দাঁড়ায়।

অনুভূতি ব্রহ্মবস্তুকে সত্য সত্য স্পর্শ করিয়াও সেটিকে পূরাপূরি ধরিতে পারিতেছে না। আর, মনন বা বিচার ব্রহ্মবস্তুটিকে স্পর্শই করে না; ধরা তো দূরের কথা। পরমহংসদেবের কথা রকমারি করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়— অনুভূতি মেয়েলোক, কাজেই সদরে এবং

অন্দরে অবাধে যাইতে পারে; কিন্তু বিচার পুরুষমানুষ, সদর পর্যন্তই তার গতি, অন্দরে তার গতি নাই। অনুভূতির তুলনায় বিচারের এই স্বাভাবিক ন্যূনতা রহিয়াছে। পক্ষান্তরে আবার বিচার তার আপন এলেকায় সর্বেসর্বা। গোটা তত্ত্বটিকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করা, সেগুলির পরস্পর তুলনা করা, তাদের শ্রেণী বিভাগ করা, তাদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ ধর্ম ও নিয়ম আবিষ্কার করা, সেগুলিকে লইয়া অনুমান, কল্পনা-জল্পনা ইত্যাদি করা— এ-সকল মননেরই কাজ। যার কাজ তারই সাজে অন্যে তার লাঠি বাজে— মনের এই কাজগুলি অনুভূতির দ্বারা চলে না। অনুভূতি ও বিচার যদি স্ত্রী— পুরুষই হয়, তবে আমাদের বলিতে হয় যে, এরা উভয়ে মিলিয়া পরস্পর আপোষ করিয়া, এই মায়ার খেলা সংসারটা চালাইতেছে; এ দুয়ের একজন ছুটি লইলে এ খেলা অচল হইয়া যায়।

এক কথায় বলিতে গেলে, মননের কাজ হইতেছে মাপ করা— যেটাকে আমরা মায়ার কাজ বলিয়াছি। এই মূল কার্যটি নানাভাবে নানা আকারে সমাধা হইতেছে। গোটা অখণ্ড সামগ্রীটির মাপ হয় না; এইজন্য আদৌ সেটিকে টুকরা করিতে হয়। এই টুকরা করার কথা, এই বলির কথা, আমরা নানা ভঙ্গীতে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে শুনিতে পাই। কখনও শুনি, ব্রহ্মা প্রজা-সৃষ্টির কামনা করিয়া নিজেকে স্ত্রী এবং পুরুষ এইভাবে দুই করিয়া লইলেন, কখনও বা কথাটাকে অনেক রকম আজগবি রূপকের ভিতর দিয়া আমরা শুনিতে পাই। আমরা অন্য নানাস্থলে এ রকমের দুই চারিটা রূপক ভাঙিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। তার পর, গোটা জিনিস হইতে যে সমস্ত টুক্‌রা আমরা পাইলাম, সেগুলিকে লইয়া নানাভাবে মাপাজোকা আমাদের করিতে হয়। কোন্ টুকরা কার চাইতে বড়ো, কার চাইতে বা ছোট; কোন্‌টা বা আগে কোন্‌টা বা পরে; কোন্‌টা বা কারণ কোন্‌টা বা কার্য—

এইরকম নানা রকমের হিসাব আমাদের করিতে হয়। এই হিসাবের উপর আমাদের ব্যবহার চলিতেছে। দেশের সম্বন্ধ, কালের সম্বন্ধ, নিমিত্তের সম্বন্ধ— মোটামুটি এই তিনটা এবং আনুষঙ্গিকভাবে আরও অনেক সম্বন্ধ না পাইলে আমাদের ব্যবহার চলে না। এই সম্বন্ধগুলির সাধারণ শাস্ত্রীয় নাম হইতেছে মাতা, মেয় ও মান সম্বন্ধ। আমি সমস্ত মাপাজোকা করিতেছি, তাই মাতা; সকল পরিচ্ছিন্ন বা টুকরা বস্তু আমার হিসাবের বিষয় হইতেছে, এইজন্য সেইগুলিকে বলা যায় মেয়; আর এই দুয়ের ভিতর কতকগুলি বাঁধা সম্পর্ক ধরিয়া যে ব্যবহার, সেইটেরই নাম মান।

সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে অশেষ রকমের; কিন্তু সবগুলিকেই মোটামুটি কয়েকটা পর্যায়ে ফেলা যায়। যেমন এক গোত্রের মানুষ যারা হইয়াছে হইতেছে এবং হইবে, তাদের সব গণিয়া ওঠা দুষ্কর; কিন্তু সব্বাইকেই একটা সাধারণ গোত্রের পর্যায়ে আমরা ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হই। বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে আমরা এদেশে এক গোত্রে সম্বন্ধ পাতাইতে চাহি না; এই যে একটা সামাজিক ব্যবহার, তার মূলে ঐ একটা সাধারণ হিসাব রহিয়াছে। একটুখানি চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি যে, আমাদের অধিকাংশ ব্যবহারের পিছনেই ঐরকম এক একটা সাধারণ হিসাব, কখনও বা স্পষ্ট কখনও বা অস্পষ্টভাবে দেওয়া থাকে। আমার আগুনের দরকার হইয়াছে, কাছে আগুন নাই। দূরে যদি ধোঁয়া দেখিতে পাই, তবে সেখানে আগুন পাইব ভাবিয়া, সেই দিকে গিয়া থাকি। বিফল হইয়া ফিরিতে হয় না। অনেক ক্ষেত্রে ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান স্পষ্টভাবে মনে থাকে না, কিন্তু অস্পষ্টভাবে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সম্বন্ধের জ্ঞানটা সংস্কারের মতন হইয়া যায়; এবং সেটিকে লইয়া আমাদের ব্যবহারও একটা অভ্যাসের মতো হইয়া দাঁড়ায়। এ সব সোজা কথার দৃষ্টান্ত দেবার দরকার নাই।

এখন, আমরা যে কথাটা বুঝিতে চাহিতেছি, সেটা সংক্ষেপে দাঁড়াইতেছে এইরূপ— আমাদের সকল রকম কারবারের জন্য যে মাপাজোকা, যে হিসাবের দরকার, সে সমস্ত এলোমেলোভাবে, খামখেয়ালিভাবে চলিতেছে না। কতকগুলি বাঁধা সম্বন্ধ ও নিয়মানুসারেই চলিতেছে। এই বাঁধা সম্বন্ধ ও নিয়মগুলি চিনিয়া বাহির করা, এবং সেগুলিকে সত্য সত্যই কাজে খাটানো— এইটাই হইল মননের কাজ। আমরা মানুষ, এই কাজটা ভালোমতে করিতে পারি বলিয়াই মনুর অপত্য— মানব।

অনুভূতির যেমনধারা নানান্ থাক আছে এবং একটা সকলকার উপরেরও থাক্ আছে, মননেরও তেমনিধারা নানান্ থাক এবং একটা সর্বোচ্চ থাকও আছে। সম্বন্ধের এলাকা ছোটো হইতে পারে, অথবা বড়ো হইতে পারে। জ্ঞাতি সম্পর্ক বলিলে এলাকা যতখানি হয়, গোত্রের সম্পর্ক ধরিলে তার চাইতে এলাকা অনেক বড়ো হইয়া দাঁড়ায়। বাঙালীর সম্পর্কের চাইতে ভারতবাসীর সম্পর্ক বড়ো; এবং তার চাইতে মানুষের সম্পর্ক আরও বড়ো; জীব বা প্রাণীর সম্পর্ক তার চাইতে বড়ো। এইরকমে সম্বন্ধগুলিকে ছোটো, বড়ো, তার চাইতে বড়ো—এইরকম ভাবে থাকে থাকে সাজান হইয়া থাকে। ন্যায়ের ভাষায় বলিতে গেলে, জাতি পর ও অপর। অপেক্ষাকৃত ছোটো জাতিকে অপর এবং অপেক্ষাকৃত বড় জাতিকে পর জাতি বলা যায়।

তাহা হইলে, সম্বন্ধ আমরা দুই দিক্ দিয়া পাইতেছি। কত রকমের সম্বন্ধ— এই একটা দিক্। সম্বন্ধগুলির ভিতর কোন্‌টা কার চাইতে বড়ো অথবা ছোটো, কোন্‌টা বেশি ব্যাপক কোন্‌টা সঙ্কীর্ণ— এই আর-একটা দিক্। দেশের সম্বন্ধ আর কালের সম্বন্ধ এক-রকমের সম্বন্ধ নয়; এদের মধ্যে জাতিগত ভেদ রহিয়াছে। কিন্তু এক দেশের সম্বন্ধ লইয়াই আমরা তার মধ্যে ছোটো, বড়, তার চাইতে বড়ো— এই রকমের হিসাব লইতে পারি। কোনও একখানা

গ্রাম তার একটা পাড়ার চাইতে বড়ো; এবং সেই পাড়াতে যদি আমার বাড়ি হয়, তবে অবশ্য আমার বাড়ির চাইতে সে পাড়াটা বড়ো এক্ষেত্রে এক দেশের সম্বন্ধ লইয়াই যা কিছু হিসাব। দেশের হিসাবের ভিতরে অন্য রকম হিসাবও আছে। তোমার বাড়ি আমার বাড়ির পূব দিকে; তার বাড়ি আমার বাড়ির পশ্চিম দিকে। এখানে কোন্‌ বাড়িটা বড়ো, তা লইয়া প্রশ্ন নয়; কোন্‌ বাড়িটা কার কোন্‌ দিকে, এই লইয়াই প্রশ্ন। দেশের সম্বন্ধ আর কালের সম্বন্ধ আলাদা রকমের সম্বন্ধ। এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টা বড়ো কোন্‌টা ছোটো, তার হিসাব হয় না। এক বিঘা জমি বড়ো, কি এক ঘণ্টা সময় বড়ো, সোজাসুজি এ তুলনা উঠিতে পারে না। কিন্তু এক সম্পর্ক ধরিয়া আমরা অবশ্য ছোটো বড়ো হিসাব করিয়া থাকি। আমাদের হিসাবে এক ঘণ্টা এক মিনিটের চাইতে বড়ো, কিন্তু একদিনের চাইতে ছোটো।

এ ছাড়া কর্ম-কারণের বা নিমিত্তের সম্পর্ক একটা আলাদা রকমের সম্পর্ক। দেশ ও কালের সম্পর্কের সঙ্গে তার সম্বন্ধ রহিয়াছে বটে, কিন্তু সেটা সে দুই হইতে অতিরিক্ত একটা কিছু বটে। যেই তালগাছে কাক বসিল, অমনি তাল পড়িল দেখিয়া আমরা অনেক সময় কাকটাকেই তাল ফেলার জন্য দায়ী করিয়া থাকি বটে, কিন্তু সে বেচারী, যদিও বা সে ব্যাপারের ফলভাগী হয়, তবু তার নিমিত্তের ভাগী নাও হইতে পারে। আগে হইলেই নিমিত্ত বা কারণ হয় না; এমন-কি, খ যতবার ঘটিয়াছে তার আগে ক ততবার ঘটিলেও, ক খ'এর কারণ হয় না— যেমন রাত্রি দিনের অথবা দিন রাত্রির কারণ নয়। এইজন্য ভাষাপরিচ্ছেদকারকে "অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ববর্তিতা। কারণত্বং"—এই ভাবে কারণের নিরূপণ করিতে হইয়াছে। পশ্চিম দেশে জন স্টুয়ার্ট মিল একজন বড়ো পণ্ডিত ও নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি— "unconditional invariable antecedent"-কে কারণ বলিয়াছিলেন।

যাই হউক, এইরকমধারা পদার্থ পরিচয়ের মূল সম্বন্ধ (Categories) গুলা বিশ্লেষণ করিয়া বাহির করা, এবং তাদের ঠিক ঠিক লক্ষণ ও বিবৃতি দেওয়া, মননের একটা মামুলি কাজ। আমরা "নিমিত্ত" ও "কারণ" এক করিয়া বলিতেছিলাম। কিন্তু এদেশের দর্শনে "কারণ" একটু ব্যাপক অর্থে, আর "নিমিত্ত" কতকটা অব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন, ন্যায়-বৈশেষিক মতে, কারণ ত্রিবিধ— সমবায়ি, অসমবায়ি, নিমিত্ত।

ঐ যে "ব্যাপক" কথাটা বলিলাম (তার সঙ্গে সঙ্গে "ব্যাপ্তি"ও আসিয়া পড়িল), ওটাও পদার্থের একটা খুব চলিত সম্পর্ক। কে কার সঙ্গে কতখানি দেশে এবং কতসময়ে থাকে বা থাকে না— এই হিসাব লইয়া আমরা পদার্থ সকলের মাপাজোকা করিতেছি; একটাকে পাইয়া অপরটার অনুমানাদিও করিতেছি। এই ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ ঠিক ঠিক বুঝিতে দার্শনিককে বিস্তর মেহন্নৎ করিতে হয়। ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমানে ভুল হইল না, কিন্তু বহ্নি দেখিয়া ধূমের অনুমানে ভুল কেন হইবে— ইত্যাদি সমস্যার সমাধানে যত্ন করিতে হয়। সে অনুমানের ভুলে কাজে ঠকিতে হয় বলিয়াই করিতে হয়। যে সূত্র (লিঙ্গপরামর্শ, ব্যাপ্তিজ্ঞান) ধরিয়া অনুমান করিব, সেটি যত বিশ্বাসযোগ্য হইবে, ততই অনুমান ঠিক হইবে, এবং অনুমানের সূত্র ধরিয়া কাজও সফল হইবে। আমাদের অনেক কাজের মূলেই অনুমান (ইষ্টসাধনতাজ্ঞান ইত্যাদি)— ইহা মনে রাখিতে হইবে।

গোড়াতে এ সব কথার বিস্তার করার আবশ্যকতা নেই। আমরা গোড়ায় যে কথাটা বুঝিতে চাহিতেছি, সেটা এই— গোটা অনুভূতি (Experience) মননের এবং পরিমাপের বস্তু না হইলেও, তার টুকরাগুলি লইয়া মনন চলিতেছে; সেগুলিকে লইয়া "ব্যবহার" করিতে হইবে, কাজ চালাইতে হইবে বলিয়াই, মনন করিতে হয়। যিনি এ কাজে যত লায়েক, তিনি তত বুদ্ধিমান। "অনুভব" প্রভৃতি শব্দ দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। আমরা

—২

কিন্তু অনুভূতি শব্দটাকে বড়ো ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতেছি। প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, অনুমান, সংশয়, রাগ দ্বেষ, ইচ্ছা, প্রযত্ন— এসব তো বটেই, তা ছাড়া তাদের "বিষয়",— যেগুলোকে সত্য সত্যই আমাদের চিন্তার বাহিরে (Objective) আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি— এ সমস্ত জড়াইয়া আমাদের "অনুভূতি" (Experience)। এর ভেতরে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি জ্ঞানগুলোও রহিয়াছে, আবার তাদের "বিষয়"ও (গাছপালা, মাঠ ঘাট ইত্যাদি) রহিয়াছে। জ্ঞান (Thought) এবং জ্ঞেয়ের (Thing) মধ্যে যে তফাৎ আমরা সচরাচর করিয়া থাকি, সে তফাৎ, সে "ভাগ— বিলি", সে "বণ্টন" এই গোটা অনুভূতি— জগতের ভিতরেই হইতেছে। এই বণ্টনের প্রসাদে যেটি "অদিতি" (কিনা, ছেদহীন), সেটি "দিতি" (কিনা, দুই ভাগে খণ্ডিত, পরিচ্ছিন্ন) হইয়া যায়; যেটি বাহ্য (objective) অথবা আভ্যন্তর (subjective) এ দুয়ের কোনোটাই নয়, সেটি বাহ্য ও আভ্যন্তর এই দুইভাবে নিজেকে সাজাইয়া থাকে। স্বরূপে, যেটাকে আমরা অনুভূতি বলিতেছি, সেটা "neutral'— অর্থাৎ বাহ্য কিম্বা মানস, এ দুয়ের একতর নয়।

আর-একটা কথা বোধ হয় আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিব—এই অনুভূতির জগতের একটা সীমা টানিয়া বলা যায় না যে—"বস্ এটা এতটা, এর বেশি নয়।" প্রয়োজনের খাতিরে অবশ্য আমরা এর খানিকটা "বাছিয়া" লই; বাকিটাকে আমল দিই না। ভাবি ও বলি যেন— বাকিটা নেই-ই। কিন্তু, আমাদের "ইষ্ট" ভাগটার চারধারে আরও অনেক কিছু যে রহিয়াছে, তা আমরা আগেই দু-একটা উদাহরণ নিয়ে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। এখন, এই অনুভূতির জগৎটার চৌহদ্দি অব্যবস্থিত (indefinite) হইলেও, এবং এর ভিতরে "বিষয়" এবং "জ্ঞান" দুই মিলিত অথবা পৃথক্ ভাবে থাকিলেও, এটা ঠিক যে, এ জগৎ একেবারে নিরতিশয় ভাবে পূর্ণ ও সত্য জগৎ নয়। এর চৌহদ্দি আমি দিতে পারিতেছি না বটে,

কিন্তু এটা কখনও বড়ো, কখনও বা ছোটো হয়— তা দেখিতেছি; এটাকে নিয়ত পরিবর্তিত হইতেও দেখিতেছি; নতুন অনেক কিছু আসিতেছে, আবার চলিয়া যাইতেছে।

একটা ছোটো পাহাড়ের ওপর বসিয়া লিখিতেছি। চার ধারে প্রভাতের রৌদ্র বন জঙ্গল মাঠ ও ক্ষেতগুলোতে পড়িয়া একটা চমৎকার দৃশ্যপট আমার মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে টাঙাইয়া ও পাতিয়া রাখিয়াছে। যখন কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া চাহিতেছি, তখন আমার অনুভূতির জগৎ ঐটা। চারধারে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাকাইতে হইতেছে— কাজেই সে জগৎও আমি পাইতেছি "এক নিশ্বাসে" নয়। যাই হোক— সে জগৎটা যে মস্ত বড়ো তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন কাগজের উপর চোখ রাখিয়া মাথা গুঁজিয়া লিখিতেছি, তখন আগেকার ঐ বড়ো জগৎটার বদলে ছোটো একটা জগৎ আমি পাইতেছি— কাগজ, কলম, কম্বল, চারধারের তুচারটা জিনিস— এই সব নিয়ে। অবশ্য, বড়ো এবং ছোটো— এ তুয়ের বেলাতেই জগৎ শুধু যে "বাহিরের" এমন নয়; মনের চিন্তা, বেদনা ইত্যাদিও (তাদিগকে "সজ্ঞানে" আলাদা করি আর নাই করি) তার মধ্যে। কথাটা পাইতেছি যে, জগৎ আমার কাছে ঠিক একভাবে নেই, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নেই, চলিতেছে, নব নব হইতেছে। চলিতেছে বলিয়াই এটাকে বলি "জগৎ"।

এখন, এই জগতের খানিকটা নিয়ে আমার (এবং আমার মত যারা তাদের) কারবার। সচরাচর সবটায় দরকার আমার হয় না। আমি নিজেকে জগতের অংশ মনে করি; তুমি, সে, এবং আর আর জিনিসগুলোকে আর আর অংশ মনে করি। মনে করিয়া তাদের সঙ্গে নানান্ রকমে কারবার করি। জগতের সকল অংশ বা "কেন্দ্র" (Centre) গুলোও পরস্পরের সঙ্গে এক বিরাট কারবারের সূত্রে বাঁধা। ইচ্ছা করিলেই যে কারবার (action and reaction) হয়, আর ইচ্ছা না করিলে হয় না-এমন যেন না ভাবি। একটা

মহাশক্তিব্যূহ (Stress-system)-এর ভিতরে জগতের সব কেন্দ্রই রহিয়াছে ; কোনোটাই অপর কোনটার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হইয়া নেই। বহুদূরে থাকিয়াও ঐ মহাব্যূহ কেউ এড়াইয়া যাইতে পারে না।

কিন্তু, তা হইলেও, ইচ্ছা করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাদের সঙ্গে আমি সম্পর্ক পাতাই, অথবা, আমার শারীর ও মানসিক বন্দোবস্তের ফলে যাদের সঙ্গে আমার কারবার "খোলাখুলি ভাবে" পাতাইতে হয়, তাদের লইয়াই আমার "কারবারি জগৎ" (Pragmatic Universe)। অবশ্য, এ জগতেরও একটা নিয়ত ধরাবাঁধা ব্যবস্থা ও গণ্ডী ঠিক হইয়া নেই। আগে আমরা মনোযোগের "সার্চ-লাইটের" পরিচয় পাইয়াছি। এখানে প্রয়োজন বা দরকারের (Interest) সার্চলাইটের কথা আসিয়া পড়িতেছে। জগতের সেইটুকখানি বাছিয়া লইয়া আমি কারবার করি, যেটুকখানিতে তখনকার মতন আমার দরকার। অন্য কিছুতে দরকার হইলেই সার্চলাইটের মুখ ঘুরিয়া যায়। ফুটপাথ দিয়ে চলিতে চলিতে কেউ বা দেওয়াল বা থামের গায়ে থিয়েটার বায়োস্কোপের "পোস্টার"-গুলোতে বিশেষভাবে নজর দিতে দিতে চলিতেছে ; কেউ বা বই-এর, কেউ বা কাপড়-চোপড়ের, কেউ বা ওষুধের দোকানগুলোতে। যার ভেতরে যে দরকারটা বড়ো।

আমাদের শারীর ও মানসিক "যন্ত্র" এমনিভাবে তৈরি যে, মোটের ওপর, জগতের কতক অংশের বা কেন্দ্রের সঙ্গে তার কারবার নিকট ও "সজাগ" হইয়া থাকে ; বাকি অংশগুলোর সঙ্গে কারবার সচরাচর তত নিকট ও সচেতন হয় না। আমাদের জীবনযাত্রা চালাইবার জন্যই মোটের ওপর এইরকমধারা বাছিয়া লওয়া ও বাদসাদ দেওয়ার বন্দোবস্ত বাহাল হইয়া গিয়াছে। ঘাড় তুলিয়া আকাশপানে চাহিয়া আমরা চলিতে পারি বটে, কিন্তু আকাশের তারা গোণার চাইতে আমাদের পায়ের তলায় ও চারভিতে আমাদের "শত্রুমিত্র" বাছিয়া চলার কার্যতঃ দরকার

বেশি—বেঁচে থাকার জন্যই বেশি ; এইজন্য অবকাশমত, বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া, আমাদের জ্যোতির্বিদ্ হবার সাধ পূরাইতে হয়। যখন তখন, যে সে অবস্থায়, আকাশের তারা গুণিয়া চলিতে গেলে, কথামালার সেই কুয়োয় পড়া জ্যোতিষীর মতন দুর্দশা আমাদের হইতে পারে।

তবে যখন আকাশের তারাতেই আমার প্রয়োজন, তখন তাতেই আমার পক্ষপাত বেশি হবার কথা। তখন ছাদে যাইয়া, যথাসম্ভব চারধারের বিক্ষেপ সরাইয়া, আমাকে যন্ত্র লইয়া আকাশ দেখিতেই নিবিষ্ট হইতে হয়। তখন, আমার চারধারের জিনিসগুলোর চাইতে, ঐ পরার্ধ যোজন দূরেকার নীহারিকাপুঞ্জ, আমাদের পরিদৃশ্যমান জগতের (galactical system) বাইরে ঐ সব আলাদা জগৎ ("island universes") আমার "নিকট সম্পর্ক"।

এইরকম কারবারি সম্পর্ক কখন কার সঙ্গে হইবে, তার ঠিক নেই ; তবে মোটের ওপরে, "খোস মেজাজে ও বাহাল তবিয়তে" থাকার জন্য, আমাদের চারধারের জগতের খানিকটার সঙ্গে বেশি সম্পর্ক রাখিয়া চলিতে হয়। বলা বাহুল্য, একথাটা মোটামুটি ভাবেই সত্য। যে ব্যক্তি তার "যথাসর্বস্ব" কামস্‌কাটকায় রাখিয়া আসিয়া কলিকাতায় বসবাস করিতেছে, সে তার বসবাসের স্থানের অবস্থা-ব্যবস্থা অবশ্য উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে না, কিন্তু, তার সব চাইতে "জীবন্ত" সম্পর্ক ও কারবার ঐ কামস্‌কাট্‌কার সঙ্গেই।

দুইটা সার্চলাইটের কথা হইল বটে, কিন্তু আসলে, সার্চলাইট একটাই। সচরাচর কারবারের জন্যই আমরা দেখাশোনা করি। তাই আমাদের ভেতরে একটা মূল বন্দোবস্তের ফলে, একদিকে যেমন আমাদের বাছিয়া দেখাশোনা প্রভৃতি অনুভব হইতেছে, অন্যদিকে তেমনি গ্রহণ-বর্জন (হান-উপাদান) প্রভৃতি জীবনযাত্রার কারবারগুলোও চলিতেছে। যাহা রহিয়াছে বা হইতেছে ("Given"), তার মধ্য থেকে নিজেদের রুচি এবং দরকার মতো

বাছিয়া লওয়া— এইটাই হইল কথা। বাছিয়া লওয়া আর মাপিয়া লওয়া— আসলে একই কথা। মাপটি সূক্ষ্ম ও খাঁটি হবার বন্দোবস্ত হইলে আমরা পাই Science—"Science is measurement." আমাদের শারীরিক ও মানসিক বন্দোবস্তটাকে— যার প্রসাদে আমরা বাছিয়া বাছিয়া অনুভব করি, আস্বাদ করি, গ্রহণ— বর্জন করি —যদি বলি "যন্ত্র", তবে, এই যন্ত্রের যেটা "মন্ত্র" বা বীজশক্তি, সেটা হইতেছে অমিত বস্তুকে মাপ করা, অখণ্ডিত বস্তুকে ছেদ করা। এদেশের উচ্চ প্রস্থানের দর্শন তাই সেটাকে বলিয়াছেন, "মায়া"।

ভাবিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারি যে, জগৎকে— যার ভেতরে আমরা নিজেরাও রহিয়াছি— আমরা দুইবার করিয়া "বলি" দিতেছি। এই "বলি" দেওয়া ব্যাপারটা প্রাচীনেরা "যজ্ঞ" বলিতেন। ঋগ্‌বেদাদিতে বারবার পাই— প্রজাপতি বা বিশ্বকর্মা "যজ্ঞ" করিয়া নিখিল প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাদের জন্য উপযুক্ত "অন্ন" যজ্ঞ করিয়াই উৎপাদন করিয়াছেন। এ যজ্ঞ জগৎসৃষ্টির মূল বন্দোবস্তটাই। প্রথমে-- যেটা নিরতিশয়ভাবে পূর্ণ ও সত্য জগৎ (অথবা, সেটাকে "জগৎ" না বলিয়া "তত্ত্ব"— Reality—কেউ কেউ বলিতে চাহিবেন) সেটা কোনও এক বন্দোবস্তের ফলে নানান্ "কেন্দ্রে", নানান্ অনুভূতি-জগতে বিলি হইতেছে ; অর্থাৎ, তার ভেতরে "তুমি", "আমি", "সে", "এ সকল", "ও সকল"— এই রকম আলাদা আলাদা মালিকানায় আলাদা আলাদা জগৎ বিলিবন্দেজ হইতেছে ; আমরা প্রত্যেকেই সেই অদিতি (অখণ্ডিত, অবিচ্ছিন্ন) সত্তার গর্ভে নিজের নিজের এলাকা মাপিয়া লওয়ায় এক একজন "আদিত্য" রূপে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি— প্রত্যেকেই নিজের নিজের অধিকার নির্বাচন করিয়া লইয়াছি ও লইতেছি। নিজে নিজে ইচ্ছা করিয়াই এ কাজটা যে করিতেছি তা নয় ; কোনো একটা মূল আবেগ (impetus) এর ফলেই এ ঘটনা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। সেই মূল আবেগটাকে প্রাচীন শাস্ত্র কখনও "কাম",

কখনও কখনও "তপঃ", কখনও "সঙ্কল্প", কখনও বা "ঈক্ষা" বলিয়াছেন। আমরা পরে দেখিব— এইরকমধারা একের বহু হবার প্রয়াসের গোড়ায় কোনো না কোনো ভাবে "মিথুন" হবার অপেক্ষা থাকে— অন্ততঃ আমাদের যতদূর হিসাব ও বোঝাপড়ার দৌড়, তাতে থাকে। সেই আদি মিথুনটিকে (Duality) শাস্ত্র—সকল প্রাচীন দেশেই "স্ত্রী-পুরুষ" রূপে দেখাইয়াছেন। "যৌন-সঙ্কেত" (Sex symbol) তাই সকল পুরাণে সৃষ্টিকথায় আমরা দেখিতে পাই। ঋগ্‌বেদাদিতে অদিতির গর্ভে "দ্যাবা-পৃথিবী" জন্মিলেন শুনি। সে দ্যাবা-পৃথিবী সেই আদি মিথুনের প্রতীক ও সঙ্কেত। এ কথা আমরা আবার পরে পাইব।

তারপর, আদিত্যেরা (কিনা, আমরা) জন্মিয়াই "কি খাই কি খাই" করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। ঐতরেয় উপনিষদে মূলতত্ত্বটি গল্পচ্ছলে অতি সুন্দর করিয়া শোনানো হইয়াছে। আমাদের প্রত্যেকেরই "অন্ন" চাই। অন্ন মানে ভাত ডাল শাক সব্‌জি তো বটেই, তা ছাড়া যা কিছু আমাদের এই শারীর ও মানস যন্ত্র বাহির হইতে আহরণ করিতেছে, টানিয়া লইতেছে, তাই অন্ন, তাই আহার। চোখে যা দেখিতেছি, কাণে যা শুনিতেছি, মনে যে সুখ— দুঃখ পাইতেছি— সে সবই অন্ন। অন্নের যা সার (বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্যের ভাষায়— "রস" বা "মধু"), তাই "সোম"। আজকাল ডাক্তারেরা ভিটামিনের কথা বলিতেছেন ; তার শ্রেণীবিভাগও করিয়াছেন ; কোন্ খাবারে কোন্‌টা কতখানি— তাও বলিতেছেন। ভিটামিন সূক্ষ্মশক্তি, এবং সেটা সম্ভবতঃ সোমের কোঠায় কোনখানে ঠাঁই পাইতে পারে। "সোম" একটা বড়ো গোছের তত্ত্ব (concept-entity), তা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। ঋগ্‌বেদাদির অনেক মন্ত্র— বিশেষতঃ সমগ্র নবম মণ্ডলটা— সে পক্ষে আমাদের সংশয় রাখিতে দেবেন না। অন্যদিকে যে তত্ত্বটি আমাদের সকলের ভিতরে থাকিয়া বিচিত্ররূপে অন্ন সেবা করিতেছেন, তিনি প্রাচীন

পরিভাষায় "অগ্নি"। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ তাই জগৎকে অগ্নী-ষোমাত্মক বলিয়াছেন।

যাই হোক, আদিত্যগণ "কি খাই কি খাই" করিয়া উঠিলে, প্রজাপতি তাঁদের অন্ন বিভাগ করিয়া দিলেন। অন্ন পাইলেন কোথায়? গোড়ায় তিনি ছাড়া তো দুই ছিল না। নিজেকেই কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ইনি কাচ্চাবাচ্চাদের খাইতে দিলেন। নিজেকে "বলি" দিয়া ইনি আমাদের সৃষ্টি করিলেন—কেননা, এক এবং পূর্ণ, এক এবং পূর্ণ হইয়াই থাকিলে, নিজের ভেতরে বহু এবং সসীম হবার বন্দোবস্ত না করিলে, "আমরা" হই না। তারপর, আমাদের "যন্ত্র"গুলোকে যথাযোগ্য খোরাক যোগাইবার জন্য ইনি নিজেকে আবার বলি দিলেন। এ দ্বিতীয় বলির ফলে, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা "অন্ন" ও "আহার" হইল— প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অনুভূতির জগৎ (World of Experience) হইল। আমরা প্রত্যেকে "আহার" ও "বিসর্গের" এক-একটা আলাদা বন্দোবস্ত। যে সমস্ত কেন্দ্রের বন্দোবস্তে মোটামুটি মিল থাকে, তাদের এক "জাতি" (Class) বলা যায়।

তারপর, আমরা জন্মিয়াই কি চুপ করিয়া থাকি— কেবল খোরাক খাইয়াই খালাস হই? নিজের নিজের জগতে আমরাও এক-এক জন বিশ্বকর্মার সেই মামুলি পার্টের রিহার্সেল দিই— অর্থাৎ আমরাও "বলি" দিই— "যজ্ঞ" করি। আমরা যে অপত্যোৎপাদন করি, তার মানেও ত্যাগ করা, বলি দেওয়া। এবং ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যক প্রভৃতি শ্রুতি প্রজা-উৎপাদনরূপ এই নৈসর্গিক ব্যাপার-টাকে পঞ্চাগ্নি-বিদ্যাপ্রসঙ্গে যজ্ঞই বলিয়াছেন। এ ছাড়া আমাদের প্রত্যেক মানসিক ব্যাপারেও আমরা যে গোটা অনুভূতির জগৎটাকে কাটিয়া টুক্‌রা টুকরা করিতেছি, টুকরাগুলিকে মাপিতেছি (অর্থাৎ, এটা এই, এতটা, এতদূর পর্যন্ত— এইভাবে হিসাব করিতেছি), তাদের পরস্পর তুলনাদি করিতেছি, তাদের কোনোটাকে বা বাছিয়া

লইতেছি, কোনোটাকে বা বর্জন করিতেছি— এ সকল কথা আমরা আগেই বুঝিয়া রাখিয়াছি। এ সমস্ত ব্যাপারই "বলি"।

কিন্তু একটা মজার কথা এই যে, গোটা বা পূর্ণ বস্তু "বলি" হইয়াও গোটা বা পূর্ণ রহিয়া যান। আমি যখন ভাবিতেছি— আমি এখন সামনের পাথরটাই দেখিতেছি, আর কিছু দেখিতেছি না— তখনও আমার গোটা অনুভূতির জগৎ ঐ পাথরটাই নয়; পাথরটা মাত্র আমার অভিনিবেশের কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছে; সেটাতেই আমার পক্ষপাত হইতেছে; সেটাকেই আমি বাছিয়া লইয়াছি। সব সময়েই এই রকম। পূর্ণের সত্য সত্যই "বাধ" বা অপলাপ কখনোই হইতেছে না, হয় না। আমি কার্যতঃ, ব্যবহারতঃ, তার খানিকটা আমার "যন্ত্র" দ্বারা "কাটিয়া" লইয়া, সেইটাই বলি আমার তাৎকালিক "জ্ঞান" বা "জ্ঞেয়"। (স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমার অনুভূতি-জগতের স্বরূপ লক্ষণ দিতে গেলে, সেটাকে "জ্ঞান" বলাও ঠিক নয়, আবার "জ্ঞেয়" বলাও ঠিক নয়; সেটা উদাসীন— neutral; বিশ্লেষণে, বলা-কহায়, সেটাকে জ্ঞানভাবে দেখা হয়, আবার জ্ঞেয়ভাবেও দেখা হয়।)

তাই বলি, গোটা বস্তু গোটা রহিয়াও, ব্যবহারে অংশ, খণ্ড, টুকরা হইতেছে। গোটা বস্তু (মাণ্ডূক্য শ্রুতির ভাষায়) "অব্যবহার্য" কিনা, তাই সেটাকে কাটিয়া আমরা ব্যবহার করিতেছি। এই রকমধারা কাটার নাম "বলি"। পুরাণে কশ্যপের ভার্যাদের মধ্যে দুজনের খুব খ্যাতি আছে— অদিতি ও দিতি। ধাতুর মানে নিলে, যার ছেদ নেই এবং যার ছেদ আছে। কশ্যপ আত্মা। আত্মার দুটি বৃত্তি। একটায় গোটা অনুভূতি হইতেছে— বহুকে একের ভিতরেই দেখা হইতেছে। অপরটায় এক বহু হইতেছে— গোটা অনুভূতি টুকরা টুকরা হইতেছে। একটা অভেদ, অদ্বৈত দৃষ্টি, অপরটা ভেদ, দ্বৈত দৃষ্টি। আত্মার এই দুই দৃষ্টিই রহিয়াছে; তাই

তাঁর দুই "ভার্যা"। দিতির কাজ "বলি' দেওয়া। তাই দিতিতনয়, দৈত্যরাজ বলি। অদিতির গর্ভে বামনরূপে বিষ্ণু (কিনা, সর্বব্যাপী, পূর্ণ) জন্মিলেন। অভেদ, অদ্বৈত দৃষ্টির গর্ভেই পূর্ণ "জন্মিতে" পারেন। বলি মনে করেন— তিনি যে ছোটো টুকরাটি লইয়া কারবার (কিনা, যজ্ঞ) করিতেছেন, সেটা সত্য সত্যই ছোটো; ব্যবহারে তার যে সীমা, গণ্ডী দিতেছি, সেটাই তার সত্যিকার সীমা বা গণ্ডী। আমরা প্রতিনিয়ত তাই করিতেছি— তাই মনে করিয়া আমাদের সকল ব্যবহার চলিতেছে। বলি চিরজীবী— তিনি আমাদের ভিতরে এখনও বাঁচিয়া আছেন।

কিন্তু অদ্বৈত দৃষ্টিতে যে পূর্ণতত্ত্ব (বিষ্ণু), তিনি বামন, কিনা ছোটোর, সাজে আসিয়াই বলিকে ছলিলেন। এ ছলনা যে বলির মোহ কাটানো! বলির দৃষ্টিতে ছোটো ছোটোই— আমরা যেমন সব্বাই ভাবিতেছি। বামনের দৃষ্টিতে ছোটো মাত্র ব্যবহারে ছোটো, অজ্ঞানে ছোটো; তত্ত্বতঃ, জ্ঞানে, বিদ্যায়, সেটি পূর্ণই। আমরা যেটাকে ছোটো একটা ঢেলা বা পাথর ভাবিতেছি, সেটা প্রকৃত প্রস্তাবে, ব্রহ্মই; তার সীমা নেই, পরিচ্ছেদ নেই; সকল ব্যবহারিক গণ্ডী সে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে। এ কথাটা বেদান্তের একটা নিগূঢ় কথা। এখানে আভাসে পাড়িলাম। পরে ভালো করিয়া শুনিব। প্রত্যেক বস্তুকে শ্রুতি তাই "গুহা" বলিয়াছেন। প্রত্যেক পদার্থ সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্ম তাতে "অনুপ্রবেশ" করিয়াছেন— এইরকম কথা তাই আমরা তৈত্তিরীয় প্রভৃতি শ্রুতিতে বারবার শুনিতে পাই। বিষ্ণু বামনবেশে আসিয়া বলিকে ছলনা করিলেন— এ কথার মানে এইবার স্পষ্ট হইল না কি? বলি তাঁর দ্বৈত দৃষ্টিতে যেটাকে ছোটো গুহা মনে করিতেছিলেন, তার চাইতে বড়ো একটা কিছু ধারণা করেন নাই, বামন অভেদ দৃষ্টি আনিয়া দেখাইলেন যে, সেটা সাধারণ ব্যবহারে একটা ছোট গুহা হইলেও, তাতে ব্রহ্ম রহিয়াছেন —সব চাইতে বড়ো, ভূমা যে বস্তু, তাই রহিয়াছেন। ত্রিপাদ বা

সার্ধত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করিয়া বলিকে ছলিলেন। বলি ভাবিলেন—ত্রিপাদ ভূমি আর কতটুকু। বলি স্বল্পদৃষ্টি কিনা! কিন্তু, আসলে, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, অথবা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি, এই লোকত্রয় আক্রমণ করিয়াও বামনের ত্রিপাদভূমি পাওয়া হইল না। ব্যবহারিক ছোট জিনিসের ভিতরে যে ব্রহ্ম বস্তু রহিয়াছেন, তিনি যে কেবল সে ছোটো জিনিসটার গণ্ডীর চাইতে বড়ো এমন না; তিনি সর্ববিধ সীমা অতিক্রম করিয়াছেন; ঋগ্‌বেদ ও অথর্ববেদের পুরুষসূক্তের কথায়— তিনি সকল ভূমি সর্বতঃ ব্যাপিয়াও "অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্"। শেষ পাদ তিনি জগতের আর কোথাও রাখিতে ঠাঁই পাইলেন না। তাই বলির "মস্তকে" রাখিলেন। বলির "ভেদদৃষ্টি" দূর হইল। ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলেরই এক প্রসিদ্ধ সূক্তে এবং বিষ্ণুপুরাণাদিতে বিষ্ণুর "পরম পদ"-এর কথা আছে। সে পরম পদ "মাথায় ধরিলে" অজ্ঞান থাকে না, বন্ধন থাকে না। তবে, সংসার ব্যবহারের খাতিরে অজ্ঞান চাই— গোটাকে টুকরা করিয়া দেখা ও লওয়া চাই। তাই বলি অমর হইয়া রহিলেন। তিনি ব্রহ্মকে চিনিয়াও সাধ করিয়া, পাতালে, কিনা মোহ বা অজ্ঞানে, নিজেকে বাঁধিয়া রাখিলেন। নৈলে যে, এ ভবের লীলা চলে না। তিনি বাঁধা দিয়া ভগবানের লীলাসহায় ও লীলাসহচর হইয়াছেন। তাঁর "ভক্তি"তে আমরা সংসার করিতেছি। ভগবান্‌ও কিন্তু তাঁর দুয়ারে বাঁধা আছেন। ভেদদৃষ্টি, স্বল্পদৃষ্টি, পরিচ্ছিন্নদৃষ্টি নৈলে সংসার চলে না বটে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে, একটুখানি আড়ালে, অভেদদৃষ্টি, ব্রহ্মদৃষ্টিও রহিয়াছে। আমাদের প্রত্যেক ছোটোখাটো অনুভবের পিছনেই রহিয়াছে। আমরা খেয়াল না করিলেও রহিয়াছে। তার প্রকাশ হইয়াও হইতেছে না। এটা না থাকিলে আমাদের বাঁধন কায়েমি হইত। মুক্তি আর হইত না। আমাদের ভিতরে এ রহস্য প্রতিনিয়ত চলিতেছে— তাই আমরা বলির উপাখ্যান একটুখানি তলাইয়া বুঝিতে যত্ন করিলাম।

দুই দফা বলির কথা আগে বলিয়াছিলাম। এইবার সেটা স্পষ্ট হইল কি? প্রথম বলি বা মূল বলির কল্যাণে পূর্ণ বস্তু নিজে পূর্ণ রহিয়াও নিজের ভেতরে নানান্ "লীলাকেন্দ্র" অভিব্যক্ত করিয়া তোলেন। এই কেন্দ্রগুলি এক একটি অদিতির সন্তান। কবে কোন্ দিন এ অভিব্যক্তি হইয়াছিল জানি না; হয়তো কালের সম্বন্ধে— আগে পরে করিয়া— এ অভিব্যক্তি হয়ই নাই। তবে, আমাদের বুঝিতে গেলে কালের হিসাবে বোঝাই স্থবিধা। তাই আমরা বলি— কোনো একদিন এক একাই ছিলেন; একা থাকিতে যেন তাঁর ভয় পাইতেছিল; একা থাকিয়া তিনি স্বস্তি পাইতেছিলেন না; তাই দুই হইলেন; মিথুন হইলেন; বহু হইলেন। এমনধারা "ঘটনা" ঘটিয়াছিল কি না, জানি না। কিন্তু, যে তথ্য (fact) অস্বীকার করার যো নেই, সেটা এই— এক একা হইয়া, নির্বিশেষ (undifferentiated, homogeneous) হইয়া নেই; সবিশেষ হইয়া রহিয়াছেন; নিজের ভিতরে অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্র (centres of individuality) ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। পূর্ণও যেমন রহিয়াছে, পূর্ণের ভেতরে এই সসীম বস্তুগুলিও তেমনি রহিয়াছে। পূর্ণের বা একের থাকা, আর এই অপূর্ণ বহুদের থাকা একরকমের থাকা কি না— একটা পারমার্থিক বা তাত্ত্বিক, অপরটা ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক (দৃষ্টিসৃষ্টিবাদীদের মতে ব্যবহারিক বলিয়া আলাদা সত্তা নেই) এ বিচার এখন তুলে লাভ নেই। এখন সহজেই বুঝিতে পারি যে, পূর্ণ বা একের দিক্ দিয়া দেখিলে, তার ভিতরে কোনো একটা সীমা টানিবার বা হবার বা থাকার বন্দোবস্ত, একপ্রকার "বলি"। এই "বলি" দিয়াই তিনি জীব ও জগৎ হইয়াছেন। যাঁরা পূর্ণকে সবিশেষ দেখিতেই চান— নির্বিশেষ পূর্ণকে যাঁরা পূর্ণই বলেন না— তাঁরা বলিবেন, এই "বলি" দিয়াই পূর্ণ পূর্ণ হইয়াছেন; অর্থাৎ, জীব ও জগতের অশেষ বৈচিত্র্য বাদ দিয়া শুদ্ধ সত্তা (Pure Being)— শুধু "থাকা," আর কিছু নয়—

পূর্ণ তত্ত্বই নয়। অপরে অবশ্য অন্য রকম করিয়াও দেখিয়াছেন। যাক্— সে পরের কথা।

তারপর, আমরা দেখিয়াছি যে, জগতের প্রত্যেক কেন্দ্রেই ("লীলা কেন্দ্র" কেন বলিয়াছি, তা পরে বুঝিতে পারিব) মূল বলির রিহার্সল— পুনরভিনয় চলিতেছে। আমরা যেগুলিকে "জড়" বলি, "অচেতন" বলি, তাদের ভিতরেও হয়তো চলিতেছে ; তবে, তাদের কথা এখন না হয় নাই-ই পাড়িলাম। আমাদের মতন জীবের কেন্দ্রে যে চলিতেছে, সে পক্ষে সন্দেহ নেই। তাই আমরা আমাদের গোটা অনুভূতির জগৎটা প্রায় সব সময়ই কাটিয়া ছোটো করিয়া ব্যবহারে লাগাইতেছি—প্রথমতঃ আমাদের গোটা অনুভূতির জগৎটা (জ্ঞান ও জ্ঞেয় জড়াইয়া) আমাদের চল্‌তি হিসাব— (review, judgment) এর চাইতে ঢের বড় হইলেও, তার চারধারের সীমানা ঠিক করা সম্ভবপর না হইলেও, সেটা পূর্ণ বাস্তবের (Reality-Whole) তুলনায় "বলি"। আমাদের অনুভূতি-জগতের সঙ্কোচ-বিকাশ হইতেছে ; নূতন অনেক কিছু তাতে আসিতেছে, আবার চলিয়া যাইতেছে। আমাদের অনুভূতি-জগতের কতক অংশ স্ফুটতম (centre of attentive regard) ; কতক অংশ স্ফুটতর ; কতক স্ফুট ; কতক অর্ধস্ফুট ; বাকি অস্ফুট। বাস্তব সত্যের অনেকটা এর ভেতরে অদেখা রহিয়াছে ; আবার অনেকটা হয়তো বিতথভাবে (খাঁটিভাবে, যথাযথভাবে নয়) দেখা হইয়াছে। তার অনেকটার "আবরণ" হইয়াছে ; কতকটার বা "বিক্ষেপ"ও হইয়াছে— অন্যথা, অন্য রকমে দেখা হইয়াছে। যেমন, একটা সবুজ পাতার এমন সব সূক্ষ্ম অবয়বাদি আমি "সাদা চোখে" দেখিতেছি না, যেগুলো অণুবীক্ষণে দেখা যায় ; আবার, যদি আমার পিত্তদোষ থাকে তো হয়তো সবুজকে কতকটা হল্‌দে আমি দেখিতেছি। সব অনুভবেই এইরকম এক একটা "দোষ" থাকে কি না, তা পরীক্ষা করিয়া বিচার করার বিষয়।

যাই হোক্, ঐ আবরণটা পুরাণের মধু, আর বিক্ষেপটা কৈটভ। একটা তমঃ, অপরটা রজঃ। পুরাণেই এ কথা আছে। এ দৈত্য-যুগল আমাদের ভিতরে অমর হইয়া বাস করিতেছে। এ উপাখ্যান আমরা অন্যপ্রসঙ্গে কতকটা খোলসা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখানে কথাটা এই যে, পূর্ণ বাস্তবের কাছ হইতে আমরা দুই "ধাপ" সরিয়া মাঝে ডবল পর্দা টাঙাইয়া, নিজেদের কারবার চালাইতেছি। প্রথম, যেহেতু আমরা পূর্ণ বস্তু নই, অসীম, অপরিচ্ছিন্ন বস্তু নই, তাই আমাদের জগৎ সমগ্রের ভিতরে একটা গণ্ডী দিয়ে আলাদা করা; তোমার জগৎ আর আমার জগতের গণ্ডী একই নয় (মোটামুটি মিলিলেও এক নয়); এক আমার জগতের গণ্ডীও সব সময়ে এক নয়। আমাদের জগতেরও ঠিক চৌহদ্দি দেওয়া না গেলেও, সেটা যে একটা অমেয় অমিত বস্তুর একটা পরিমাণ বা মাপ আনার চেষ্টা, সে পক্ষে সন্দেহ নেই। এইজন্য, বেদান্ত বলিবেন— আমরা ও আমাদের জগৎ, ব্রহ্ম (কিনা, অখণ্ড, পূর্ণ) বস্তুর মায়াশক্তিতে (যেটা মাপে, তাই মায়া) উৎপন্ন অথবা বিধৃত। যাই হোক্, ব্রহ্ম বস্তু হইতে এই এক "ধাপ" সরিয়া আমরা ও আমাদের জগৎ রহিয়াছে। "সরিয়া থাকা" মানে যে কি তা যেন না ভুলি। সত্য সত্যই, পূর্ণ হইতে অংশ "সরিয়া" থাকিতে পারে না।

তার পর, আর এক ধাপ সরিয়া, মাঝে আর এক প্রস্থ পর্দা টাঙাইয়া, আমরা লোকব্যবহার করিতেছি। পূর্ণ আমাদের অনুভূতিজগৎরূপে যতটা আমাদের মাপিয়া দিতেছেন, সেটাও এত বড়ো যে, ততটা নিয়ে আমাদের সাধারণ কারবার চলে না। সাগরের মতো জলাশয় পাইতেছি, কিন্তু আমাদের সচরাচর এক ঘটি জলেই কাজ হাসিল হইয়া যায়। আমাদের বড় অনুভূতির জগৎকে যে কি-ভাবে আমরা ছোটো করিয়া "বাছিয়া কাটিয়া" লইতেছি তা আগেই দৃষ্টান্ত নিয়ে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি।

এই দুই "ধাপ" সরিয়া আসাতেই আবরণ ও বিক্ষেপ হইতেছে।

অসীম সসীম হইতে যাইয়া নিজেকে কতকটা ঢাকিয়া ফেলিতেছেন ; যেটা প্রকাশ করিতেছেন, সেটাও হয়তো কিছু না কিছু "অন্যথা" করিয়া। এই শেষ কথাটা আমরা পরে বুঝিতে যত্ন করিব। তার পর আমরা আবার আমাদের গোটা অনুভূতি-জগৎটা ঢাকিয়া, তার কতকটা বাছিয়া লইয়া, কারবার করিতেছি। আমাদের রাগ-দ্বেষ-সংস্কার, কল্পনা ইত্যাদি নানান্ কারণে, আমাদের কারবারি অংশ-টুকুতেও "ভেজাল" ঢুকিয়া যায়। এ কথাটা সহজেই ধরিতে পারি।

আমাদের ও আমাদের জগতের মোটামুটি হাল তো এইরূপ। লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কোনও বিশেষ মতবাদের শরণ না লইয়াই, কোনও একটা "থিওরি" খাড়া না করিয়াই, আমরা এতক্ষণ এই মোটামুটি নক্সাখানা তৈয়ারি করিয়াছি। ইংরাজিতে যাকে "fact" বলে, আমাদের এ পর্যন্ত পাওয়া নক্সাখানা তাই।

আর একটা সত্য এই যে, আমাদের বেঁচে থাকা ও কারবার করার মূলে রহিয়াছে আনন্দ। তৈত্তিরীয়শ্রুতি "আনন্দাদ্ধ্যেব" ইত্যাদি বলিয়া, এবং বৃহদারণ্যক "এতস্যৈব" ইত্যাদি বলিয়া এই আনন্দকেই সব্বার গোড়ায় বসাইয়াছেন। ছান্দোগ্যশ্রুতি প্রসিদ্ধ নারদ-সনৎকুমার প্রসঙ্গে "ভূমা বা ব্রহ্মেই আনন্দ, অল্পে নাই"—এই বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকের কথা আর ছান্দোগ্যের কথা মিলাইয়া লইতে গেলে বলিতে হয়— নিখিল ভূত এই আনন্দের "মাত্রা" ভোগ করিতেছে এবং তাতেই বাঁচিয়া আছে বটে, কিন্তু পূর্ণ, নিরতিশয়, বিশুদ্ধ আনন্দ গোটাতত্ত্বেই থাকে ; যেখানে বাধা আছে, গণ্ডী আছে, পরস্পরের সংঘর্ষ আছে, সেখানে সেভাবে থাকে না ; অথবা থাকিয়াও না থাকার মতন হইয়া থাকে। এইজন্য জীবে ও জগতে আনন্দের চাইতে যেন দুঃখের দিকটা বেশি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন কোন দর্শনশাস্ত্র তাই নির্বাণ অথবা দুঃখনিবৃত্তিকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়াছেন। এ কথার আলোচনাও পরে আসিবে।

এখন, দুঃখনিবৃত্তিই হোক্, আর আনন্দই হোক্, সেটা সকল

রকম বাধা (constraint, limitation) এড়াইয়া যাওয়াতেই রহিয়াছে বলিয়া, সব চাইতে বড়ো, সব চাইতে গোটা যে বস্তু, সেটিকে আমরা পাইতে চাই। পাওয়া মানে— তার সঙ্গে একেবারে অভিন্ন হইয়া যাওয়াই হোক্, আর নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া তার সঙ্গে "মিলিত" হওয়াই হোক্, অথবা, আর যাই কিছু হোক্,— এ আলোচনার স্থল এ নয়। অভেদবাদ, ভেদাভেদবাদ, অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ, ভেদবাদ— এইরকম সব "মত" দর্শনে মাথা তুলিয়াছে। কতক কতক পরিচয় আমরা অবসরমত পাইব। তারপর, এই বড়ো পাওয়াটা "এক লাফেই" হয় না দেখিতেছি। মুখ্য প্রয়োজন কিন্তু এইটাই। ছোটো ছোটো দরকারের ভিতরও, জানিয়া অথবা না জানিয়া, এই মুখ্য প্রয়োজনেরই "সেবা" চলিতেছে। যে টাকা চায়, স্বাস্থ্য চায়, যশ চায়, স্বর্গ চায়, সে আসলে দুঃখনিবৃত্তি বা আনন্দই চায়। আনন্দ আর পূর্ণতা (Perfection) এক জিনিস— এপিঠ-ওপিঠ। এখন, আমাদের সংস্কার, বুদ্ধি বিবেচনা, জ্ঞান, হৃদয়— এ সবেরই ওপর অল্প বিস্তর সেই "মধুকৈটভের" অধিকার রহিয়াছে বলিয়া, আমরা সত্যকার যেটাকে চাই, সেটাকে স্বরূপে ভালো করিয়া জানি না; তাকে পাবার রাস্তাও ভালো করিয়া চিনি না ; অনেক সময় উল্টা রাস্তাই ধরিয়া বসি। এইজন্য, সেবা করিতে যাইয়া "সেবাপরাধ" হইতেছে ; মুখ্য প্রয়োজনের মাথায় লাঠি বসাইয়াও দিতেছি। মোক্ষের উপযোগী করিয়া ধর্ম, এবং ধর্মের অবিরোধে এবং নিয়মনে অর্থ-কাম— এই রকমধারা চতুর্বর্গের সেবা করার নিয়ম। না করিলে ধাপে ধাপে ওঠা যায় না বলিয়াই নিয়ম। "মধুকৈটভ" আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া ঠিক ধাপে ধাপে উঠিতে দিতেছে না। চতুর্বর্গের ভেতরে আপোস না হইয়া ঝগড়া বাধিয়া গিয়াছে। তাই "ইতোভ্রষ্ট স্ততোভ্রষ্টঃ" হইতেছি। "অমিয় সায়রে সিয়ান করিতে সকলি গরল ভেল"—হইতেছে।

এইজন্য, ভগবান্ সনৎকুমার নারদকে আহারাদি শুদ্ধি দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি লাভ করিতে, "মৃদিতকষায়" হইতে বলিলেন। অন্যথা, লক্ষ্যও ঠিক দেখা যাবে না, পথও দেখা যাবে না। দুর্গম পথে চলবার "কলিজে" ও "বুকের পাটাও" হবে না। তাই সাধন চাই, অনুশীলন চাই। সাধনের একটা আবশ্যক অঙ্গ হইতেছে চিত্তের মল ও বিক্ষেপ (মধু ও কৈটভ) দূরীকরণ। বিচারের দ্বারা, মনন ও বৈরাগ্যের দ্বারা এ কাজের যে বেশ খানিকটা সহায়তা হয়, তাতে সন্দেহ নেই। তবে মাত্র বিচার ও মননে থামিলে চলিবে না। মাত্র বিচার ও মননে "প্রতিষ্ঠা" নেই, এটাও মনে রাখিতে হইবে। আরও মনে রাখিতে হইবে যে, মনন সত্য সাক্ষাৎকার (experiment and realisation)-এর সঙ্গে অনুকূলভাবে, উপকারকভাবে, হওয়া আবশ্যক। শ্রুতিকে শ্রেষ্ঠ অনুভূতি ও তত্ত্বসাক্ষাৎকার বলিয়া আস্তিকেরা দাবী করেন। তাই তাঁরা বলেন, শ্রুতিই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, এবং শ্রুতির অনুকূলভাবেই মনন বিচারাদি করিতে হইবে। সে যাই হোক্, এটা ঠিক যে, সত্যকে সাক্ষাৎকার করা রূপ যে "দর্শন," সত্য সম্বন্ধে অনুমানাদি বিচার করা রূপ "দর্শন," তার অনুগত। শেষেরটা "মাথায় চড়িয়া বসিলেই" সর্বনাশ। শ্রুতির সেই—"অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" স্মরণ করুন। পক্ষান্তরে, সত্যকার দর্শনে—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"

এইজন্য, হিন্দু ষড়্দর্শন বিচারশাস্ত্র হইলেও শ্রুতির আনুগত্য স্বীকার করেন। উচ্চ প্রস্থানের দর্শনে (বেদান্তে) শ্রুতির উপরে নির্ভরই বেশী। লৌকিক প্রত্যক্ষ, যুক্তি বা তর্ক সম্ভবমত শ্রুতিকে ধরিতে বুঝিতেই যত্ন করিয়াছে। যেখানে কুলায় না, সেখানে স্পষ্টই হা'ল ছাড়িয়া দিয়াছে ; বলিয়াছে—"এখানে আমরা পরাস্ত ; যিনি দেখেছেন, তিনি কি কি বল্‌ছেন শুনে নাও ; পার ত' নিজেও দেখে যাও"।

যাই হোক, চল্‌তি দর্শনশাস্ত্রেরও প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য আমরা পাইলাম। আমাদের সংস্কার, বুদ্ধি, জ্ঞান ইত্যাদির সংস্কার (কিনা, দোষক্ষালন) করিয়া তাদের দ্বারা ধাপে ধাপে আমাদের অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সের (চতুর্বর্গলাভের) সুষ্ঠু উপায় দেখাইয়া দেওয়া—এইটাই প্রয়োজন। দোষের মাত্রা বুঝিয়া ক্ষালন-মার্জনের ব্যবস্থা করিতে হয়। তাই অধিকারভেদে প্রস্থানভেদ। প্রয়োজন সকলেরই এক। এই প্রয়োজন সাধনের জন্য বাস্তবকে, সত্যকে আমাদের ঠিক ঠিক জানার যত্ন করিতে হয়। সসীম, পরিচ্ছিন্ন সত্যগুলোও বটে, আবার পূর্ণও বটে। অণু, মহৎ এবং মধ্যমপরিমাণ এ সবেরই হিসাব লইতে হয়। অবশ্য, দর্শনে এদের "মূলধারা" (fundamental categories and principles) গুলো নিয়েই কারবার বেশী। মূল বস্তু ও তাদের সম্বন্ধগুলি—যাদের "পদার্থ" বলে, "তত্ত্ব" বলে, এগুলো ঠিক ঠিক না জানিলে আমাদের জ্ঞানাদি এবং অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স লাভের আয়োজন ঠিক ঠিক হবে না—তাই এ যত্ন।

প্রথম অধ্যায়

অধিকার ও প্রস্থান

কোন কিছু লিখিতে বা বলিতে গেলে চারটি জিনিষ জানিবার দরকার হয়—কি বলিব? কাকে বলিব? কেন বলিব? কেমন ভাবে বা কি করিয়া বলিব? বলার বিষয় একটা কিছু ঠিক থাকা চাই; বলার যোগ্য পাত্র বা অধিকারী হাজির কিনা, তাও বলার আগে ভাবিয়া দেখিতে হয়; কি উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনে বলিতেছি, তাও ঠিক থাকা দরকার; আর, যা বলিলাম, তাতে বলার বিষয়টা ঠিক বলা হইল কিনা; তা বলিয়া আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইল কিনা; অথবা শুনিয়া শ্রোতার কাজ হইল কিনা,—এক কথায়, বলার ফল হইল কিনা,—এ সবের খোজ ও হিসাব আমায় লইতে হয়। অনেক সময় খোলাখুলি এ সবের খোঁজ ও হিসাব না নিয়াই কিছু বলি বা শুনি বটে, কিন্তু মনে মনে এ সবের চিন্তা, তলে তলে অস্পষ্টভাবে, থাকেই। এ দেশের পুরাণো লেখাগুলিতে এই চারটি জিনিষকে "অনুবন্ধ-চতুষ্টয়" বলা হইত; আর এদের নাম দেওয়া হইত—বিষয়, অধিকারী, প্রয়োজন, সম্বন্ধ।

দর্শনশাস্ত্রের বিষয় হইতেছে, তত্ত্বকে ঠিকভাবে, গোটা করিয়া, জানা। আমরা আগেকার ভূমিকায় বলেছি—জানা কাজটা বিচার করিয়া, মনন করিয়া একরকম হয় বটে, কিন্তু আসলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, অপরোক্ষভাবে, অনুভব বা উপলব্ধি না হইলে পুরোপুরি এবং সত্যকার জানা হয় না। বিচার-বিশ্লেষণ করার দরকার আছে, এবং সেটা মনন। মনন দর্শনের একটা অঙ্গ, একটা সোপান। কিন্তু সত্যকার দর্শন—সাক্ষাৎ পূর্ণ ও যথার্থ উপলব্ধিতে। শাস্ত্রে বা মহাজনদের মুখে শুনিলাম—"এষ আনন্দময়ঃ"—আনন্দময়।

আমার যে সাধারণ, কারবারি অনুভব, তাতে কিন্তু আত্মাকে, কিনা নিজেকে, ঠিক আনন্দময় ভাবে পাই না ; দুঃখ, ত্রিতাপের জ্বালাটাই যেন তাতে বেশী দেখি। "আমি সুখী, আমি দুঃখী"—এইটাই আমার চল্‌তি অনুভব ও ধারণা। খাঁটি সুখঘন বা আনন্দস্বরূপ আমাকে আমি ত' কই চিনি না! আচার্য আমার সংশয় দেখিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তুমি নিজেকে সুখী মনে করছ ; হয়ত' জীবনে যতটা সুখ তুমি পেয়েছ বা পাবে, তার চাইতে ঢের বেশী দুঃখকষ্ট তুমি পেয়েছ বা পাবে মনে করছ। এটাও ঠিক যে, দুঃখকষ্ট কারুরই ভাল লাগে না, সব্‌বাই সেটা এড়াতে চায়। আচ্ছা, এখন জিজ্ঞাসা করি—এই দুঃখকষ্টে ভরা, ভাবী সুখের ভরসাশূন্য, এ জীবনটা তোমার এখুনি শেষ হ'য়ে যাক্—এইটেই কি তুমি চাও?" বুকে হাত রাখিয়া জবাব দিতে হইলে আমায় বোধহয় বলিতে হয়—"না, মরিতে চাই না, বাঁচিয়া থাকিতেই চাই।" এত দুঃখ কষ্ট, তবু বাঁচিয়া থাকিতে সাধ—এ সাধের কৈফিয়ৎ দেওয়া শক্ত। আচার্য ইঙ্গিতে যেটা আমায় বলিলেন, কৈফিয়ৎ তাই হইতে পারে—আমি আনন্দময়, রসস্বরূপ, সুখস্বরূপ, কাজেই, সত্য সত্য আমি মরিতে চাইব কেন? চাই যে, সেটা আমার চালাকি—নিজেকে খাঁটী করিয়া চিনিনা বলিয়া, নিজেকে আর একটা কিছু কারবারের গরজে ভাবিতেছি বলিয়া, মরিতে চাওয়ার "ভাণ" করিতেছি। কৈফিয়ৎ এইরকম হইলেও হইতে পারে। কিন্তু, কেবল বিচার-বিতর্ক করিয়া, এইটাই যে ঠিক কৈফিয়ৎ, তা সাব্যস্ত করা যাবে না। খাঁটি বৈদান্তিক আচার্য ছাড়া, সব্‌বাই যে এই কৈফিয়ৎটাই দিয়াছেন, এমনও নয়।

এমনও ত' হইতে পারে যে, আমি মরিতে রাজি নই শুধু এই কারণেই যে, এখন না হোক, ভবিষ্যতে, সুখের আশা রাখি। সুখের আশা নেই বলি বটে, কিন্তু আশা মায়াবিনী কুহকিনী, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী, তাও মনে মনে জানি। কা'ল বা দুদিন বাদে যে আমার

"সুপ্রভাত" হবে না, তা হলফ করিয়া কে বলিবে? কাজেই, আশার আশায় হয়ত, মরীচিকায়, বাঁচিয়া থাকিতে চাই! এক কথায়, কেউ কোন সময় তিন সত্যি দিয়া আমার প্রত্যয় জন্মাইতে পারিতেছে না যে—আমার পোড়া কপাল চিরদিন এমনি পুড়িয়াই রহিবে। কাজেই, কথামালার গল্পে সেই বুড়ির মতন, সত্য সত্যই শমন উপস্থিত হইলে, আমরা তাঁকে এই জীবনের দুর্বহ "কাঠের বোঝাটা" আবার মাথায় তুলিয়া দিতেই বলি।

এদেশে বৌদ্ধ দার্শনিকেরা সাধারণতঃ, এবং পশ্চিমদেশের অনেকে, ও-রকমধারা একটা "কায়েমি আমি" মানার চাইতে না মানারই দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছেন। তাঁরা অনাত্মবাদের রাস্তা ধরিয়াছেন। শূন্য বা "কিছুই না" হইল তত্ত্ব। তার ওপরে "একটা কিছু" (সৎ) রূপে যে একটা বিচিত্র নাম-রূপাত্মক—"আমি", "তুমি", "সে" এই সব প্রকারে—জগৎ ভাসিতেছে, সেটা কেবল যে "অসার" এমন নয়; তার ভেতর সবই ক্ষণিক, সবই দুঃখময়। "সর্বং শূন্যং", "সর্বং দুঃখম্", "সর্বং ক্ষণিকং"—এই ধ্বনিতে এবং প্রতিধ্বনিতে বৌদ্ধবিহারগুলি প্রায়ই ভরিয়াছিল। কাজেই, বাঁচিয়া থাকাতে, বারবার ঘুরিয়া ফিরিয়া সংসারের ঘানিগাছে ঘোরাতেই, দুঃখ; যদি সত্যকার মরিতে পারি, আর না ফিরিতে হয়, "আমি" হইতে না হয়, তা হইলেই সব লেঠা চুকিয়া গেল। সেই সত্যকার মরণই— নিঃশেষে কিছুই না হইয়া যাওয়াই নির্বাণ। আমার সকল রকম খোঁজা ও হাতড়ে বেড়ানর পিছনে, আমার সকল ছুটাছুটির মধ্যে, এই সত্যকার মরণের (আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির) কামনাই রহিয়াছে। রাস্তা ঠিক জানিনা, কিসে কি হবে তা জানি না। এইটা মোহ বা মায়া। এই মোহের দরুণই বেঁচে থাকাটা সুখের মনে করি এবং বেঁচে থাকৃতে চাই। "আমি" বা আত্মা আনন্দময় ত' নয়ই, বরং উল্টো।

এ পাল্টা কৈফিয়ৎ বৌদ্ধেরা দিয়াছেন; পশ্চিমদেশে দুঃখবাদী

(Pessimist) সোপেনহাওয়ার প্রভৃতি কেউ কেউ অনেকটা এ ভাবের কথা বলিয়াছেন। বৌদ্ধ দর্শন না হয় "নাস্তিক" দর্শন— মীমাংসা করিতে বেদ বা শ্রুতির প্রামাণ্য মানে না বলিয়া নাস্তিক ; ঈশ্বর মানে না বলিয়া নাস্তিক নয় ; আস্তিক ষড়্দর্শনের মধ্যেই কেউ কেউ ঈশ্বরকে আমোল দেয় নাই—যেমন, পূর্বমীমাংসা, নিরীশ্বর সাংখ্য ; মায়াবাদ বেদান্তেও ঈশ্বর তেমন "খাঁটি" হইতে পারেন নি। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকের আত্মাই কি কেবল আনন্দময় ? ঋষিদের অন্তর্নিহিত ভাব যাই থাকুক, এই দুই দর্শনের অনুশীলনের যে ধারা চলিয়া আসিতেছে, তাতে ত' আত্মার চৌদ্দটি গুণের মধ্যে সুখ ও দুঃখ এ দুটীকেই পাই ('বায়োর্নবৈকাদশ তেজসো গুণাঃ, জল-ক্ষিতি-প্রাণভৃতাং চতুর্দশ। দিক্কালয়োঃ পঞ্চ, ষড়েব চাম্বরে, মহেশ্বরেঽষ্টৌ মনসস্তথৈব চ॥")। "আমি সুখী, আমি দুঃখী" এ দুই অনুভবই আত্মাতে হইতেছে। যদি সংসার থেকে কখনও ছুটী পাই—যদি মুক্ত হই—তবে তখন আত্মার অনুভবের এই দুইটা শিখাই নিভাইয়া যাইবে। এঁরা যে সমস্ত যুক্তি দিয়ে আমাতে কোন কোন গুণের উদয় হওয়া আবার মিলিয়ে যাওয়া বুঝিয়ে দেন, সে সব যুক্তি মানিতে গেলে আত্মাকে "আনন্দময়—আনন্দস্বরূপ" রূপে পাওয়া যায় না। কাজেই, আমি দুঃখ কষ্ট পেয়েও মরিতে চাই না বলিয়া আচার্য যে আমায় ব'লেছিলেন—"তুমি সত্য সত্যই সুখস্বরূপ," সে কথার দাম কেবল বৌদ্ধের বিহারে নয়, ন্যায়ের চতুষ্পাঠীতেও যাচাই করিয়া পাওয়া গেল না। বিচারে বা তর্কে মীমাংসা হয় নাই দেখিতেছি। তাই বলিয়া, বিচারের কুস্তির আখড়ায় বাহ্বাস্ফোটের অভাব কোন দিনই হয় নাই।

অমন করিয়া হইল না দেখিয়া আচার্য হয়ত রকমারি করিয়া আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন। আত্মা আনন্দময়, কেননা, আত্মার বা আমার চাইতে প্রিয় বস্তু আর কি আছে ? বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে তাই বলিয়াছিলেন। যা কিছু বল,

সবই আমার ইষ্ট—আমাকে সুখী করে—বলিয়াই প্রিয় ; কিন্তু আমি আপনাআপনি প্রিয়। কথাটা লাগসই বটে ; কিন্তু সংশয় একবারে যায় কৈ ? পরের জন্য—দেশের জন্য, সন্তানের জন্য, অন্য প্রিয়জনের জন্য, আত্ম-বলি ত' দেখা গিয়াছে। এর ভেতরে কতক কতক নিষ্কাম, অহেতুক আত্মবলিও বোধহয় আছে। এর পাল্টা জবাব যে দেওয়া যায় না অথবা দেওয়া হয় নি, এমন নয়। তবে তর্ক এইভাবে উঠিতে পারে যে, নিজেকে যখন পরের জন্য বলি দিতে পারি, তখন নিজে আর সব চাইতে প্রিয় বস্তু কিসে ; আর তা যদি না হই, তবে আর, পঞ্চদশীকার প্রভৃতির মতন, আত্মাকে পরমপ্রেমাস্পদ বলি কি করিয়া ? আর সেইটাকেই ধরিয়া আত্মা যে নিরতিশয়রূপে আনন্দময়, তাই বা বলি কেমন করিয়া ?

আর বেশী দূর যাবার দরকার নেই। তত্ত্বনির্ণয়ে বিচার বা মননের কতক দূর পর্যন্ত দৌড় আছে, শেষ পর্যন্ত তাতে কিনারা হয়না এইটে বলাই উদ্দেশ্য। শেষের কিনারা করার জন্য আত্মা বা আমি আসলে কি, তা উপলব্ধি করার অপেক্ষা আছে। এমন উপলব্ধি, যেটা আমার কার্‌বারি বাহালি "আমি সুখী, আমি দুঃখী" এই মিশ্র অনুভূতিটা ভেজাল বলিয়া ধরাইয়া দিবে। সেটা যে কেমন করিয়া হয়, তার উপায় মহাজনেরা চিন্তা করিয়া গিয়াছেন, পথও দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সুষুপ্তিতে বা গাঢ় নিদ্রায় (যাতে স্বপ্নও দেখিনা) নিজেকে আনন্দময়ভাবে আস্বাদ করার প্রায় কাছাকাছি গিয়া থাকি বলিয়া শ্রুতি আমাদের শুনাইয়াছেন। সমাধি বলিয়া একটা অবস্থা লাভ করিতে পারিলে নাকি এ পক্ষে আর সন্দেহের লেশ থাকে না। বেদান্তদর্শন প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদে ১২ হইতে ২১ পর্যন্ত সূত্র ব্রহ্মের আনন্দময়ত্ব দেখাইতে যত্ন করিয়াছেন। তবে, বলিতে হইবে না, সেখানে শ্রুতির দোহাই-ই বেশী। শ্রুতি মানে ঋষিদের কাছ থেকে শোনা কথা বটে (সব কথাই শ্রুতি নয়), কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে যে, যাঁরা দেখিয়াছেন, তাঁরাই ঋষি—মন্ত্র

এবং মন্ত্রার্থ, দুই-ই। ইংরাজিতে বলিতে গেলে— সেটা Expert Evidence, যাঁরা Experiment করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁদের সাক্ষ্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সম্বন্ধে হইলে, অথবা লৌকিক প্রত্যক্ষ অনুমান ইত্যাদির যোগ্য বিষয় সম্বন্ধে হইলে, সেটাকে আমরা আজকার সায়ান্সের কোঠায় ফেলিয়া দিই; আর, অতীন্দ্রিয়, অসাধারণ অনুভূতির যোগ্য বিষয় হইলে সেটাকে আমরা, এদেশে, শ্রুতির কাছারিতে দাখিল করিয়া দিই। সময়ে সময়ে স্মৃতির কাছারিতেও বটে। শ্রুতি ও স্মৃতি দুটো পরিভাষা, খানকতক পুঁথিমাত্র নয়। শ্রুতি বড় আদালত, স্মৃতি ছোট আদালত। ছোট আদালত হইতে বড়তে আপীলও চলে। কথা কয়টা সংক্ষেপে পাড়িলাম। পরে একটু ভাল করিয়া বলিতে হইবে।

দর্শনের বিষয় তত্ত্বকে জানা, এবং সে জানা যে শেষ পর্যন্ত কি হইতে পারে, তা আমরা কটাক্ষে দেখিয়া লইলাম। অল্প কথায়, তত্ত্ব (Reality) যে কি (ক'টা, কত বড়, কি রকম, অনেক যদি হয়ত, তাদের পরস্পর কি সম্পর্ক), তা যাঁরা জানেন, অথবা জানেন বলেন, তাঁদের কাছ থেকে শুনে নেওয়া ভাল। যেমন, আমি কি— আমার জন্ম, জীবন, মরণ কি—কোথা হ'তে আসলাম, কোথা যাব— আমি ছাড়া আর যা কিছু র'য়েছে, তাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি, কার্‌বার কি ভাবে—এসবের চাইতে "ঘরের খবর," দরদের প্রশ্ন, আমার আর কিছুই হইতে পারেনা। যিনি খবর দিতে পারেন বলিতেছেন, তাঁর কথা শুনিতে আমায় ছুটিতে হবেই। চিরদিন মানুষ ছুটে এসেছে। জঙ্গলীদের "ম্যাজিক ম্যান," "মেডিসিন্ ম্যান" এই খবরটা দিতে পারে ব'লে, জঙ্গলীরা তার চারধারে জড়' হয়েছে; তার চরণে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়েছে। আমাদের দেশে ঋষিরা, সাধকরা, মহাজনেরা খবর রাখেন বলিয়া আমরা সমিৎপাণি হইয়া তাঁদের দ্বারস্থ হইতে চাহিয়াছি, সেবা করিয়াছি, পরিপ্রশ্ন করিয়াছি। এটাকে বলে শুশ্রূষা। এটা

স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক কৌতূহল, সংশয়, জিজ্ঞাসা, শুশ্রূষাতেই দর্শনের জন্ম।

কিন্তু শুনেই ত' সব কথা বোঝা বা ধরা যায় না। যেটা বোঝা যায়, সেটাকে ভাল মতে ধরিতে বা পাইতে হইলে, আরও কিছু করিতে হয়। আমার পিপাসা হ'য়েছে। কেউ বল্‌ল—ঘরে কুঁজোয় ঠাণ্ডা জল র'য়েছে। শুনেই ত' তৃপ্তি হয় না। ঘরে ঢুকে কুঁজো হ'তে জল গড়িয়ে খেতে হয়। "আত্মা নিত্য মুক্ত বুদ্ধ শুদ্ধ" একথা কয়টা বার বার শুনিয়াও বাঁধন ঘোচেনা। দুঃখ কষ্ট যায় না। কোন নতুন যায়গায় গিয়ে দিগ্‌ভ্রম হ'লে লোকের মুখে শুনেই সে ভ্রম দূর হয় না। কোন্ দিকে সূর্য উঠিতেছে বা অস্ত যাইতেছে, তা ভাল করিয়া দেখিয়া, অনেক আয়াসে, সে ভুল ভাঙ্গে। বেদান্তে "তত্ত্বমসি," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"—এই রকমের "মহাবাক্য" শোনার পর অপরোক্ষজ্ঞান হবার কথা কেউ কেউ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু সেটা হবার জন্য খাঁটি অধিকারী হাজির থাকা চাই। সে অধিকারী যে কেমন, তা আমরা অল্প কথায় পরে বলিতেছি। শোনার পরই দেখা—একথা বলিলে, মনন ও নিদিধ্যাসন বা ধ্যানকে সহকারি কারণ অন্ততঃ পক্ষে বলিতেই হয়।

ফল কথা, মনন বা বিচার এবং নিদিধ্যাসন অথবা গভীর, একতান ভাবনা, এ দুইটারই দরকার আছে। নহিলে, দর্শনের যা প্রয়োজন, তা সিদ্ধ হইবে না। প্রয়োজন তত্ত্বকে জানা; এমন ভাবে জানা, যাতে সংশয় পারত পক্ষে রহিবে না। যাঁরা এভাবে জানার কথা বলেন, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বলেন যে, তেমনভাবে জানিলে অপবর্গ বা পরম-পুরুষার্থ লাভ হয়। আমাদের যা কিছুতে প্রয়োজন, তাই পুরুষার্থ। প্রয়োজন অনেক কিছুর। সব চাইতে বড় (পরম বা চরম) প্রয়োজনও (বা Object) একটা কিছু আছে বলিয়া মনে হয়। সবগুলিকে জড়াইয়া একটা শ্রেণীবিভাগও করা যাইতে পারে। এদেশে পুরুষার্থ চার রকমের মনে করা

হইত—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। শেষেরটাই পরম বা চরম। সত্য সত্য সেটার জন্য আর সব, সেইটাই চরম বা মুখ্য। নাম আরও আছে—মুক্তি, অপবর্গ, নিঃশ্রেয়স ইত্যাদি। তাই বলিতে-ছিলাম—তত্ত্বকে জানা, অথবা ঠিক ঠিক (যথার্থ ও পূর্ণভাবে) জানা, এইটা হইল দর্শনের উদ্দেশ্য। আর ঠিক ঠিক জানিলে সকল বন্ধন মোচন হয়, দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি হয়, পরমানন্দ-সম্প্রাপ্তি হয়—এইটা হইল চরম ফল। অথবা, তত্ত্ব সেটি, যেটিকে জানিলে তাতে অব্যভিচারী অনুরাগ বা প্রীতি হয়। আর সেই প্রীতিই পরম সুখের, সুতরাং জীবের পরম পুরুষার্থ, এমন মনে করিলেও চলে।

সব দর্শনের গোড়াতেই তাই উদ্দেশ্য আর ফলের কথা রহিয়াছে। বরং বেদান্ত দর্শনে (ব্রহ্মসূত্রে) গোড়ায় উদ্দেশ্য আর ফলের কথা নেই, শেষ অধ্যায়ে আছে। অবশ্য ভাষ্যকার, টীকাকারেরা দস্তুর-মত গোড়াতেই সে বিচার করিয়াছেন। পাতঞ্জলদর্শনে চারিটি পাদ—সমাধি, সাধন, বিভূতি, কৈবল্য। পুরুষের কৈবল্য বা মুক্তিটাকে সামনে রাখিয়া তারই উপায় দেখাইয়া দেওয়াই এ দর্শনের আসল কাজ; তত্ত্বের বিচার ও পরীক্ষা অনেকটা সাংখ্য-শাস্ত্রের সম্মত পদ্ধতিক্রমেই হইয়াছে: উপায়নির্দেশের জন্য আবশ্যক বলিয়া সে পরীক্ষা করা হইয়াছে। উদ্দেশ্যটা আসলে সাধনোপায় দেখান'—practical। পূর্বমীমাংসা বা জৈমিনি-দর্শনে ধর্ম "জিজ্ঞাসা" হইয়াছে। বেদে যে সমস্ত ক্রিয়ার প্রবর্তক বচন (বিধিনিষেধ) আছে—যজ্ঞাদি বিষয়েই হোক্, আর উপাসনাদি বিষয়েই হোক্, অথবা আর যে কোন বিষয়েই হোক্, সেই সমস্ত দ্বারা যেটীকে লক্ষ্য করা হয়, তাই ধর্ম (প্রথম অধ্যায়, প্রথম পাদে, দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যে শবর স্বামী এই ভাবেই কথা কয়টা বলিয়াছেন)। বেদ ("প্রত্যক্ষ"), এবং স্মৃতি ("অনুমান") যদি বেদবিরোধিনী না হয় ত'—এই দুইটী ধর্মের আকর। প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় পাদে এ লইয়া বিচার আছে। আমরা পরে এ সম্বন্ধে দু'চার

কথা বলিব। এখন, ধর্ম অনুষ্ঠানের যা যা ফল, তা শ্রুতি বা স্মৃতিই আমাদের শুনাইয়া রাখিয়াছেন। তাকে ফলশ্রুতি বা ফলস্মৃতি বলে। সে ফলের ভিতরে সকল পুরুষার্থই অবশ্য পড়ে। শ্রুতি বা স্মৃতিকে একটা Dogmatic Authority বা Tradition ভাবে দেখার দস্তুর চলিয়াছে। এভাবে দেখিলে তার প্রতি অবিচার করা হয়। আমরা সংক্ষেপে এদের কথা পরে বলিতেছি। যাই হোক্— পূর্বমীমাংসার প্রয়োজনও খুব practical। সাংখ্যে ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে পরম পুরুষার্থ, এবং সেইটাই সাংখ্যশাস্ত্র আলোচনার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন—এই রকমে দেখান হইয়াছে।

বাকি রহিল, ন্যায়-বৈশেষিক। এখানে ওপর ওপর দেখিলে প্রয়োজনটা অন্য রকমেরই মনে হয়। প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয় প্রভৃতি পদার্থের আলোচনা—এ ত' লজিকের সামিল ; আর দ্রব্য, গুণ, কর্ম প্রভৃতির আলোচনা—এ ত' বেশীর ভাগ বিজ্ঞান, এমন কি জড়-বিজ্ঞান (ফিজিক্‌স) এর এলেকায় গিয়া পড়ে। এ সবের আলোচনায়, বুদ্ধির পরিমার্জনা হইতে পারে ; অন্য রকমের কিছু লাভও হইলে হইতে পারে ; কিন্তু মুক্তি ?

বৈশেষিক দর্শন গোড়াতেই "ধর্ম ব্যাখ্যা করিব" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আরম্ভ করিলেন। ধর্ম কি—এ প্রশ্নটা মনে স্বভাবতই ওঠে। যাতে ক'রে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স পাওয়া যায়, তাই ধর্ম— এই উত্তর পেলাম। অভ্যুদয় মানে উন্নত অবস্থা। এই উন্নত অবস্থা বলিতে যে কি বুঝিব তা লইয়া টীকাকারেরা অনেক কথা বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বলেন, অভ্যুদয় মানে সুখ। সুখ প্রবৃত্তির পথে, কিনা, প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম পালিয়াও আছে, আবার নিবৃত্তি বা বৈরাগ্যের পথেও (সন্তোষ, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা এই সব ভাবের দ্বারা চিত্তপ্রসাদে) আছে। কিন্তু প্রবৃত্তির পথে হাঁটিলে —ধর্মের রাস্তা ধরিয়া হাঁটিলেও—দুঃখের হাত একেবারে এড়ান' যায় না। তবে ধর্মের শাসন না মানিয়া হাঁটিলে সুখের চাইতে দুঃখই

বেশী পাইতে হয়, দেখা গিয়াছে। আর ধর্মের শাসন মানিয়া চলিলে, চিত্তশুদ্ধি হয় বলিয়া, দুঃখের ভাগ ক্রমশঃ কমিয়া আসে ; একেবারে দুঃখ এড়িয়ে যাবারও একটা উপায় হয়। সে উপায়টা হয়, যখন তত্ত্বজ্ঞান হয় তখন। নিঃশ্রেয়স মানে মোক্ষ—যার চাইতে শ্রেয়ঃ আর কিছু নেই। তা হইলে পাইলাম যে, যা হইতে ঐহিক ও পারত্রিক সুখ এবং পরিশেষে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি হয়, তাই ধর্ম। টীকাকার শঙ্করমিশ্র অভ্যুদয় মানে তত্ত্বজ্ঞান, আর নিঃশ্রেয়স মানে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি—এইরকম ধরিয়াছেন। যাতে ক'রে তত্ত্বজ্ঞান হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে সকল দুঃখ একেবারে অতিক্রম করা যায়, এই ধর্ম।

অল্প কথায়, অভ্যুদয় মানে সোজাসুজি উন্নতি বা সুখই বলি, আর তত্ত্বজ্ঞানই বলি, তত্ত্বজ্ঞান নইলে যে দুঃখ একেবারে যায় না, এ পক্ষে দুই মত নেই। ভাল কথা। এখন, তত্ত্ব মানে যদি আত্মতত্ত্ব হয়, তবে কথাটা মনে লাগে বটে। আমি দুঃখ কষ্ট পাচ্ছি ; জন্মাচ্ছি, মর্‌ছি, নানা বাঁধনে বাঁধা র'য়েছি। যদি বুঝি যে, আসলে আমি এ সব কিছু নই ; অজ্ঞান বা ভুলের জন্যেই নিজেকে ও রকম ভাব্‌ছি, আর সেইজন্যে মিছে কষ্ট পাচ্ছি, তবে, তত্ত্বজ্ঞানই যে দুঃখ এড়াবার উপায়, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকদর্শনে তত্ত্ব, এমন কি মুখ্য তত্ত্ব, কেবল ত' আত্মা নয়। আর পাঁচটা তত্ত্বের (নয়টা দ্রব্য) ভেতর আমিও একটা। এমন কি, আত্মার তত্ত্ব নিয়ে এ দুই দর্শনে যতটা পরিশ্রম করা হইয়াছে, তার চাইতে ঢের বেশী পরিশ্রম করা হইয়াছে অনাত্ম (আত্মা নয়) তত্ত্ব নিয়ে। আর যেমন যেমন ক'রে বা যে যে প্রমাণে তাদের জানা যাবে, তাই নিয়ে। আত্মার আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই যখন প্রয়োজন, তখন এ সব বাজে খাটুনির কি দরকার? বিদ্যা ত' নানান্ রকমের রহিয়াছে—জড়বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি। এদেশেও বটে, ও দেশেও বটে। বৈশেষিকদর্শনে জড়বিজ্ঞান বা

ফিজিক্সের মূল কথাগুলোর আলোচনাই বেশী পাই। ও দেশের ফিজিক্স ত' কৈ বলে না—আমার উদ্দেশ্য জীবকে মুক্তি দেওয়া। যেটা সত্য, সেটাকে জানা, ঠিক ভাবে জানাই প্রয়োজন। সে জ্ঞানকে যদি কোন ব্যবহারে লাগান যায় ত' উত্তম ; না লাগাইতে পারিলেও জানার জন্য জানিতে হইবে ; অন্ততঃ অনেকে চাইতে-ছেন। ন্যায়দর্শনে প্রমাণ-প্রমেয়ের প্রসঙ্গই বেশী। নব্যন্যায়ে ত' প্রমাণের আলোচনাই প্রায় সবটা। তর্কশাস্ত্র বিশেষ—লজিক। লজিকের সঙ্গে "আত্মা অথবা পরমাত্মা কি"—এই তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ কোনও সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সম্বন্ধ যদি না থাকে, তবে, ফিজিক্স লিখিতে বা লজিক লিখিতে বসিয়া তত্ত্বজ্ঞানের কথা, মুক্তির কথা বলা, "ধান ভানিতে মহীরাবণের গীত" হইয়া পড়ে না কি ?

একথার জবাব ন্যায়-বৈশেষিকের আচার্যেরা দিয়াছেন। আত্ম-তত্ত্ব কি তা ঠিক জানা (নির্ণয় মানে "বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাব-ধারণং নির্ণয়ঃ"—সংশয় করিয়া, পক্ষ ও প্রতিপক্ষ এই দুয়ের দ্বারা পদার্থ নিরূপণ করা) সোজা কথা নয়। নানা সংশয় মনে আসে। কেউ বলেন—এই দেহটার অতিরিক্ত আত্মা নেই ; কেউ বলেন—আছে। কেউ বলেন—তাদের কোন গুণ নেই ; কেউ বলেন—আছে। কেউ বলেন—নিত্য ; কেউ বলেন—অনিত্য ইত্যাদি। আত্মা ছাড়া আর যদি কোন তত্ত্ব থাকে ত', তা থেকে আত্মাকে আলাদা ক'রে (সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য—similarity ও dissimilarity) দিয়ে দেখা চাই। নইলে, "আত্মা এই, এই নয়" এ ভাবে ঠিক করিয়া জানা হয় না। তা যদি না হয় ত' সন্দিগ্ধ জ্ঞান নিয়ে আত্মাকে আশ্রয় ক'রে একতান ভাবনা বা নিদিধ্যাসন করাও চলে না ; মনে সংশয় থাকে, এটা ওটা চিন্তা এসে মনকে বিক্ষিপ্ত ক'রে দেয়। তারপর, সংশয় দূর করা বা নির্ণয়ের যে উপায় (প্রমাণ), তাও ভালমতে ঠিক করিয়া নেওয়া চাই। যদি ইন্দ্রিয়গোচর ছাড়া কিছুকে

প্রমাণ বলিয়া না মানিতে হয়, তবে, বোধহয়, চার্বাকাদির মত, আত্মাকে দেহই ভাবা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এর ওপর অনুমানকে প্রমাণ মানিলেও হয়ত' সব গোল মিটিবে না। এইজন্য প্রমাণ ঠিক ঠিক কি এবং কি নয়, তা গোড়াতেই ভেবে নিতে হয়। নইলে, আত্মতত্ত্ব অথবা কোন তত্ত্বই নিরূপিত হইবে না। এইজন্য ঠিক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হোক্, পরম্পরা সম্বন্ধে, ক্ষিতি, জল, দিক্, কাল প্রভৃতি দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সমবায়, সামান্য, বিশেষ, অভাব—এসবের আলোচনা আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের জন্যও প্রাসঙ্গিক। প্রমাণ-পরীক্ষাও আবশ্যক বটে। বৈশেষিকদর্শন গোড়াতে চতুর্থ সূত্রেই কৈফিয়ৎটা দিয়াছেন। নব্যন্যায়ের অন্যতম আচার্য জগদীশ তর্কালঙ্কার 'তর্কামৃত' বইখানার গোড়াতেই কয়টা কথা অল্পের ভেতর বেশ গোছাইয়া বলিয়াছেন।

তা হইলে, ব্যাপারটা দাঁড়াইতেছে এইরূপ : উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন মুখ্যভাবে আত্মার কথাই আলোচনা করিয়াছেন। আর যা কিছু তাতে আছে, সে সমস্তই আনুষঙ্গিক, গৌণ বা উপ-কারক ভাবে। পূর্বমীমাংসা কর্মের কথা (যার ভেতর উপাসনা, ধ্যান-ধারণাদিও পড়ে) বলিয়াছেন। কর্ম সকামও বটে, নিষ্কামও বটে। কর্ম আর ফলের একটা নিয়ত, ধরা-বাঁধা সম্বন্ধ আছে—যেমন, আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে। উপযুক্ত কর্ম চাই। কর্মের এই Art এবং Scienceই মীমাংসা দর্শনের মুখ্য আলোচ্য। জীবনের অভ্যুদয়ে, এবং শেষ কালে, পরম পুরুষার্থ যেটি, সেটীর লাভে কর্মের এইরকম ধারা আর্ট মেনে চলার যে দরকার আছে, তা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। কোন একটা উপায়-উপেয় ব্যবস্থাই আর্ট। আমাদের সকল রকম ব্যবহারক্ষেত্রেই এটার প্রয়োজন। সে যুগে সাধনের আর্ট অন্যরূপ ছিল; এ যুগে আর্ট কতকটা অন্যরূপ হইয়াছে। প্রয়োজন ও পদ্ধতি কতকটা অন্য রকমের হইয়াছে। যাই হোক্—কর্মমীমাংসা তখনও ছিল, এখনও আছে। এখনকার

কর্মমীমাংসায় জীবের মুক্তির প্রতি উপযোগিতা তেমন স্পষ্ট নয়। তখনকার দিনে পূর্ব ও উত্তর—এই দুটো জড়িয়ে মীমাংসা দর্শন ছিল, ধর্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—এই দুটো মিলে মানুষের পূরো জিজ্ঞাসা হ'ত। কর্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের সম্বন্ধ নিয়ে পূর্বাচার্যেরা বিস্তর আলোচনা ক'রে গেছেন। কিন্তু, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হোক্ পরম্পরা সম্বন্ধে (চিত্তশুদ্ধি, বিবিদিষা বা জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করে ব'লে) কর্মের উপযোগিতা কেউ উড়িয়ে দেন নি।

তারপর, সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শন আত্মা বা পুরুষকে, প্রকৃতি আর তার "সন্ততি"গুলো হ'তে আলাদা ক'রে দেখিয়ে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি বা মোক্ষের উপায় ক'রে দিয়েছেন। পুরুষের নিজের গুণ নেই; তিনি শুধু দেখেন, সব প্রকাশ করেন। প্রকৃতি তাঁতে নিজের কর্ম সুখ-দুঃখ চাপিয়ে তাঁকে "সুখী দুঃখী" এইরকম একটা মহা ভুলে ফেলেছেন। প্রকৃতি তাঁকে ছেড়ে স'রে দাঁড়ালেই, তাঁর এ ভুল ভেঙ্গে যায়। তখন তাঁর "স্বরূপেঽবস্থানম্"। সেইটেই মুক্তি। পাতঞ্জল অষ্টাঙ্গ যোগের রাস্তা খুলে দিয়েছেন—এই অবস্থায় পৌঁছুবার জন্যে। এখানে, আত্মজ্ঞান আলোচনার কেন্দ্রে থাকলেও অনাত্মা বা প্রকৃতির আলোচনাও খুব ফলাও ক'রে কর্‌তে হ'য়েছে। কেননা, "এটা আত্মা নয়" এ জ্ঞানটা, "এই আত্মা" এই জ্ঞানের জন্যে দরকার; বিশেষ, যদি আত্মা ও অনাত্মার জ্ঞান গোলমেলে হ'য়ে, তাল পাকিয়ে থাকে। তাই নেই কি?

ন্যায়-বৈশেষিক আত্মার চাইতে অনাত্মায় মনোযোগ বেশী দিয়েছেন। কেন দিয়েছেন, তা আমরা আগেই বুঝতে চেষ্টা ক'রেছি। স্বাভাবিক বন্দোবস্তের ফলে আমরা "বাহির" লইয়াই ব্যস্ত বেশী। মাণ্ডূক্য উপনিষদের ভাষা ব্যবহার করিতে গেলে, এটা "বহিশ্চেতঃ" অবস্থা। এ অবস্থায় দেখি, অনেক জিনিষ রহিয়াছে; তাদের মধ্যে আত্মাও (বা আমি) "দশের একজন" হইয়া রহিয়াছে। সেই দশের সঙ্গে তার কারবার। কারবারের ফল সুখ দুঃখ। কাজেই, এ

অবস্থায় (attitude বা standpoint এ) দশের সঙ্গে মিলাইয়াই, তাদেরই একজন ভাবে আত্মাকে দেখিতে ও বুঝিতে হয়। আত্মাকে এই "দশের একজন" ভাবে খাঁটি করিয়া জানাই তত্ত্বজ্ঞান। তাতেই নিঃশ্রেয়স বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি। কেন না, যদি বুঝিতে পারি যে, আত্মায় দুঃখ কষ্ট আশ্রয় করিতেছে, আত্মা নিজেকে দেহ ইন্দ্রিয় (ভূত-ভৌতিক) এদের সঙ্গে গুলাইয়া ফেলিতেছে বলিয়া—"আমি শরীর, আমি ইন্দ্রিয়, আমি মন" এই মিথ্যা জ্ঞানের দরুণ, তা হইলে, ন্যায়দর্শন প্রসিদ্ধ অপবর্গ সূত্রে যেমন দেখাইয়াছেন, সেই মিথ্যা জ্ঞান বা ভুলটা ভাঙ্গিলেই দুঃখ কষ্ট আর থাকিবে না। সঙ্গে সঙ্গে সুখও চলিয়া যাইবে কিনা, আত্মা মাটি-পাথরের মতন "জড়" হইয়া রহিবে কিনা—এ একটা প্রশ্ন বটে। কিন্তু এ প্রশ্ন এখন তুলিয়া কাজ নেই। দুঃখ আর থাকে না—এইটেই পেলাম। ফল কথা, ন্যায়-বৈশেষিকের নানান্ পদার্থের আলোচনা, বিশেষ করিয়া, প্রমাণের আলোচনা, যে কিভাবে মুক্তির সাধনায় প্রাসঙ্গিক (relevant), তা আমরা দু'চার কথায় বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। তত্ত্বজ্ঞানের, বিশেষভাবে, আত্মতত্ত্বজ্ঞানের যে ক্ষেত, সেটাকে চষিয়া তাতে ফসল বোনা ও তৈরি করা সাংখ্য-পাতঞ্জল এবং বেদান্তের কাজ। তবে, ফসলের ক্ষেত কাঁটার বেড়া দিয়া ভাল মতে ঘিরিয়া দিতে হয়। নয়ত' বাইর থেকে অনেক কিছু সে ফসল নষ্ট করিয়া দিতে পারে। ন্যায়, বিশেষভাবে, ক্ষেত্রের এই "কণ্টকাবরণ"। ক্ষেত চষা এবং আগাছা নিড়াইয়া ফেলাও দরকারী কাজ, এ কাজটাও ন্যায়শাস্ত্র করে।

বহিশ্চেতঃ অবস্থা থেকে ক্রমে অন্তশ্চেতঃ (যাতে ভিতরের দিকে দৃষ্টি ও অভিনিবেশ যায়) অবস্থা আসে। Standpoint টা more and more psychological, epistemological and "critical" (কাণ্ট যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন) হইয়া পড়ে। এই অন্তর্দৃষ্টির স্ফুরণ——উত্তরোত্তর স্ফুরণ—আমরা সাংখ্য আর বেদান্তে

দেখিতে পাই। সাংখ্যের, এবং সঙ্গে সঙ্গে পাতঞ্জলের, চরম যে দুইটা তত্ত্ব—পুরুষ আর প্রকৃতি—তারা ঠিক ভিতর আর বাহির নয়। আমরা সচরাচর আত্মা আর অনাত্মা বলিতে যা বুঝি, তাও নয়। ইংরাজিতে যাকে Subject বা Self বলে, সাংখ্যের পুরুষ তা নয়। এটি প্রকাশমাত্র, "দৃশিমাত্র," শুধু জানা—যে জানার কোন রকম চেহারা বা নাম নেই—সেটা "এ রকমে জানা বা ও রকমে জানা, এটা জানা বা ওটা জানা" নয়। চৈতন্তের রোশনাই—যেটা আছে বলিয়া সবই দেখা যাইতেছে; যেটা না থাকিলে সবই "আঁধার"। আর সে "আলোতে" যা কিছু ভাসিতেছে, প্রকাশ হইতেছে, বিচিত্রভাবে, সেইটা প্রকৃতির বিকৃতি, পরিণাম। কথাটা অন্য এক প্রসঙ্গে খোলসা করিতে চেষ্টা করিব। এখানে পাইলাম যে-তত্ত্বকে ভাঙ্গিয়া পুরুষ আর প্রকৃতিরূপে দেখান,' আমাদের ভূমিকায় যেটাকে Fact বা Experience বলিয়াছি, তারই বিশ্লেষণ—analysis। ভিতর-বাহির, জড়-আত্মা এই রকমের সব কারবারি ভাগ ছাড়িয়া, একেবারে গোটা জিনিসটাকে ধরার যত্ন এখানে দেখিতে পাই। আদতির খোঁজ-তল্লাস হইয়াছে। ধরা তিনি এখনও পড়িলেন না। তবে তিনি নিজেকে "অর্দ্ধনারীশ্বর", প্রকৃতি-পুরুষ-রূপে দেখাইলেন। Standpoint epistemological and critical সন্দেহ নেই। বেদান্তে অদ্বৈত বা অভেদ দৃষ্টি ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য, সেখানেও রকমারি আছে—ভেদাভেদ, অচিন্ত্য ভেদাভেদ, ভেদ বা দ্বৈত। তবে, এক করিয়া, গোটা করিয়া, দেখার দিকেই ঝোঁক্‌টা বেশী।

জগতের উপকরণগুলির যে নিদান ন্যায়-বৈশেষিক দিয়াছেন, আর যেটা সাংখ্য দিয়াছেন, সে দুটার তফাৎ লক্ষ্য করার জিনিস। লক্ষ্য করিলে, মোটের ওপর এদের দৃষ্টি যে কোন্ দিকে, তা বুঝিতে পারি। একজন জগৎটা ভাঙ্গিয়া মাটি, জল, বাতাস, ইত্যাদি আর তাদের সূক্ষ্ম দানাগুলি, দিক্, কাল, ঈশ্বরের ইচ্ছা, অদৃষ্ট—এই সব

—৪

দেখাইতেছেন। অবশ্য, ক্ষিতি যে মাটি নয়, অপ্ যে জল নয়, তা পরে বলিব। কিন্তু দেখিতেছি যে, খোঁজ হইতেছে বাইরে; আমরা যেটাকে নিজের ভেতর বা আত্মা বলি, তার ভেতর বীজের তল্লাস হইতেছে না। আত্মা (জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুই মূর্তিতে) "দশের একজন" হইয়া যেন দূরে সরিয়া রহিলেন। অদৃষ্ট আর ঈশ্বরের প্রযত্ন যোট করিয়া জগতের "পাকশালায়" তদারক করে বটে, কিন্তু ঐ তদারক পর্যন্তই, আর বেশী কিছু না। কথাটা দ্বিতীয় অধ্যায়ে খুলিয়া বলিব। কিন্তু সাংখ্যে কি দেখি? স্থূল পদার্থগুলি কেবল যে সূক্ষ্মের দিকে যাইতেছে এমন না; সূক্ষ্মগুলিও ক্রমে ভিতরের দিকে আসিতেছে। 'অহঙ্কার' বলিয়া একটা তত্ত্ব, তা থেকে দুটো ধারা বেরিয়ে গিয়ে একদিকে অনুভবের (Experience এর) বিষয়গুলো, অন্যদিকে তাদের পাবার যন্ত্র (ইন্দ্রিয়) গুলো তৈয়ারি করিতেছে। অহঙ্কার আস্‌ছে "বুদ্ধি" থেকে। এই অহঙ্কার আর বুদ্ধি ঠিক "আমি" আর আমার অন্তঃকরণ নয়। তা আমরা পরে দেখিব। তা না হইলেও, "আমি" দিয়ে, "আমার" বুদ্ধির নমুনা দিয়েই এ দুটোকে বুঝিতে হইবে। একটা হাইড্রোজেনের দানার ভেতরেও "অহঙ্কার" আছে, এবং তার পেছনে "বুদ্ধি" বা মহত্তত্ত্ব আছে। কিন্তু আমার নিজের ভেতরেই এদের প্রথম ও স্পষ্ট পরিচয়টা পাই। কথাগুলো এখানে হেঁয়ালির মতন ঠেক্‌ছে, নয়? ভেবে দেখার দরকার হবে।

সাংখ্যে এই রকমধারা ভিতরে খোঁজ করিয়া বাহিরটারও মূল ও নিদান (Origin and explanation) বার করার চেষ্টা হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত যে দুইটা—পুরুষ-প্রকৃতি—রহিল, তারা যে সাধারণ ভিতর আর বাহির, আত্মা আর অনাত্মা নয়, তা আমরা আগে বলিয়াছি। তা হইলেও, ভিতর আর বাহির, আত্মা আর পরের, সাধারণ ভেদের একটা "লেশ" বা জের এখানে রহিয়াছে। প্রকাশ বা চেতনা যেন ভিতর, যেন আত্মা; আর যেটা প্রকাশিত

হইতেছে—মনেই হোক্ আর জড়েই হোক্—সেটা যেন, প্রকাশের তুলনায়, বাহ্য, জড়, পর, অনাত্মা ;—এইরকমটা মনে হয় না কি ? চেতনাটা যেন আলাদা জিনিস ; তার বিষয়টা (content) অপর একটা জিনিস। দুয়ে মাখামাখি করিয়া থাকে, কিন্তু তেল আর জলের মতন মিশ খায় না। একটা আপন, অপরটা পর। দুটোকে আলাদা করাই ভাল। বেদান্তে এই ভিতর-বাহির, আপন-পরের তফাৎটা হয় মুছিয়া ফেলিতে হয়, নয়ত' একের ভেতরেই কোন না কোন রকমে পাইতে হয়। এইজন্য, বেদান্তের দৃষ্টি (standpoint)-টীকে ঠিক বহিশ্চেতঃ বলা যায় না, অন্তশ্চেতঃও বলা যায় না।

জিজ্ঞাসু বা অর্থীর দৃষ্টি এই রকমধারা নানান্ "থাকের" হইতে পারে। সেইজন্য তত্ত্বজিজ্ঞাসার নিবৃত্তি নানান্ রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছে। যে গোড়ায় বাইরেই খুঁজিবে কিসে কি হয়, তাকে তাই খুঁজিতে দাও। তার চোখ জোর করিয়া চাপিয়া ধরায় লাভ নেই। চোখ বুজিলেই কিছু "ধ্যানী" হওয়া যায় না। বাইরে খোঁজার গোল, ত্রুটি, বাইরে খুঁজিতে খুঁজিতেই বাহির হইয়া পড়িবে। অবশ্য, যে কোন্দল করিবেই, তাকে কেউ থামাইতে পারে না। তবে, বাইরেই খোঁজা চলুক, আর ভিতরেই চলুক, খোঁজা নিষ্ঠার সঙ্গে, একাগ্রতার সঙ্গে হওয়াই দরকার। মনোযোগ একবার ভিতর, একবার বাহির—এই রকমধারা চঞ্চল হইয়া থাকিলে খোঁজের কাজটাই পণ্ড হইয়া যাইবে। এইজন্য, যে বাইরে খুঁজিতেছে, তাকে বলা ভাল—"ভাল করিয়া খোঁজ, বাইরেই সব আছে।" দৃষ্টি যেমন নানান্ থাকের, দর্শনও তেমনি নানা প্রস্থানের। প্রতি প্রস্থানেই খানিকটা "গোঁড়ামি" (এই মত ঠিক, অপর মত ঠিক নয়) দেখিতে পাই। কিন্তু নিষ্ঠা, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্বীক্ষার সাফল্যের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে, সে "গোঁড়ামি" যে দোষেরই এমন নয়। তবে সব তারই বাড়াবাড়ি আছে। দর্শনগুলির ঝগড়ার দিক্‌টা যতটা আজকাল আমরা ফুটিতে দিয়াছি, তাদের মিল,

সামঞ্জস্য বা সমন্বয়ের দিক্‌টা ততটা ফুটিতে দিই নি। বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যের গোড়াতে, এবং আরও কেহ কেহ, মিলনের দিক্‌টা দেখাইতে গিয়া ভালই করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ 'ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি'তে উদয়নাচার্য পরমেশ্বর বিষয়ে নানামতের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—"সুপ্রসিদ্ধানুভবে ভগবতি ভবে সন্দেহ এব কুতঃ কিং নিরূপণীয়ং"—অর্থাৎ, মত যত রকমেরই থাকুক না কেন, এ জগতের একজন অসাধারণ কারণ কেহ আছেন, এটা ত' সুপ্রসিদ্ধানুভব, এতে সন্দেহ কোথায়? সকল বিভিন্ন মতের মধ্যেও একটা স্থির মিলনের কেন্দ্র আছে—এটা উদয়ন আমাদের দেখাইলেন। কিন্তু সন্দেহও যে হইতে পারে, তা আমরা সহজ বুদ্ধিতেও বুঝিতে পারি। তিনিও "তদিহ সংক্ষেপতঃ পঞ্চতয়ী বিপ্রতিপত্তিঃ"—এই সংশয়ের হেতুগুলি দেখাইয়াছেন, এবং তাদের বিচার করিয়াছেন। ফল কথা, মিলের দিক্‌টা পূর্বাচার্যেরা না দেখিতেন, এমন না। পরে বোধ হয় আপোসের চাইতে ঝগড়াটাই প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঋষিরা যে কৌশলে দর্শনের সূত্রগুলি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাতে, যে ব্যক্তির ঝগড়ার চেয়ে আপোসেই লক্ষ্য বেশী, সে তার সূত্র বা ইঙ্গিত, সূত্রগুলির ভেতরে দেওয়া আছে দেখিতে পাইবে।

একটা দৃষ্টান্ত: বৈশেষিক দর্শন তৃতীয়াধ্যায়, দ্বিতীয় আহ্নিকে আত্মা ("আমি" এই অনুভবের বিষয়) যে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম এই তিন রকম প্রমাণেই জানা যায়, এ কথা বলিয়া ১৯, ২০, ২১, এই তিন সূত্রে আত্মা, একই কি অনেক, এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, বৈশেষিকের যেটা সম্প্রদায়গত সিদ্ধান্ত চলিতেছে, তাতে আত্মা নানা বা অনেক এইটেই বলা হয়। সুখ, দুঃখ আর জ্ঞান, এদের আশ্রয় (বা সমবায়ি কারণ) যদি আত্মা হয়, তা হইলে সেটা সকল শরীরে এক হইতে বাধা কি? আলাদা আলাদা শরীরে যে আলাদা আলাদা সুখ-দুঃখাদি হইয়া থাকে তার কারণ

আত্মা (আশ্রয়টি) আলাদা বলিয়া নয়; আশ্রয় ছাড়াও সুখ-দুঃখাদি হ'বার অবশ্য অন্য রকমের কারণ আছে; বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই অপর কারণগুলি বিভিন্ন বলিয়াই সুখ-দুঃখাদি বিভিন্ন হইতেছে। উনিশের সূত্রে এই যুক্তি দিয়া আত্মা যে "ঘটে ঘটে" এক, তা কণাদ আমাদের বলিলেন। এখন, এটাকে সিদ্ধান্ত-সূত্র মনে করিলে পরের সূত্র দুটিকে অন্যরকম ভাবে বুঝিতে হয়— হাঁ, আত্মা আসলে সর্ব ঘটে একই বটে; "ব্যবস্থা" বা ব্যবহারের খাতিরে সেই এক আত্মাকে নানারূপে দেখা ও বলা হয় (২০ সূত্র); আর, আত্মা যে সত্য সত্য এক, তা ত' শাস্ত্র (শ্রুতি স্মৃতি) বার বার এক বাক্যেই বলিয়াছেন (২১ সূত্র)। এ রকমে বুঝিলে শারীরক বেদান্তের কথাই পাইলাম। কিন্তু সাম্প্রদায়িকেরা প্রথম সূত্রটাকে "পূর্বপক্ষ" (জেরা) রূপে লইয়াছেন। কুড়ির সূত্রটাই সিদ্ধান্ত-সূত্র। সুখ-দুঃখাদির আশ্রয় আত্মা এক হইলেই চলিতে পারে মনে হয় বটে, কিন্তু এক যদি ত' সকলের সুখ-দুঃখ গুলাইয়া যায় না কেন? তোমার সুখ-দুঃখাদি আমার, আমারটা তোমার— এরকম হয় না কেন? কাজেই ব্যবস্থার জন্য আত্মা নানাই বলিতে হয়। শাস্ত্রেও আত্মা অনেক, এভাবের কথা আছে। একও বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তার মানে এই যে, সব আত্মাই সজাতীয়; ব্যক্তিগুলি পৃথক্, জাতি এক।

এই রকমধারা সূত্রগুলির ভেতরে ভেদের কথা আর সমন্বয়ের কথা, দুইই, কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট ভাবে, দেওয়া আছে। ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁর ফেলোশিপ বক্তৃতায় বেশ করিয়া আগেকার ঐ সমন্বয়ের সঙ্কেতটি আমাদের ধরাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

ষড়্দর্শনের মধ্যে মিল স্বভাবতই থাকার কথা। উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সকলগুলির এক— সেটা হইল অপবর্গ; সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হোক্, আর পরম্পরা সম্বন্ধেই হোক্। গন্তব্য স্থান একই। নানান রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছেন বটে ("রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু-কুটিল নানাপথজুষাং"), কিন্তু যে আলোকে পথ দেখিয়া বা দেখাইয়া

চলিয়াছেন, সে আলোকও শেষ পর্যন্ত এক। সে আলোক শেষ পর্যন্ত শ্রুতি বা আগম। এ জিনিষটা যে কি তা আমরা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। এখন, এই আগমের সঙ্গে বিরোধ হইলে প্রত্যক্ষ আর অনুমান এ দুটিকেই নাকচ করিয়া দিতে হইবে— এই হইল হিন্দু ষড়্দর্শনের সাধারণ প্রতিজ্ঞা। ছয়খানি আস্তিক দর্শনের মতন ছয়খানি নাস্তিক দর্শনেরও খ্যাতি ছিল— মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, চার্বাক, দিগম্বর (জৈন)। কুমারিলভট্ট (শ্লোকবার্ত্তিকে), শঙ্করাচার্য (শারীরক ভাষ্যে) এবং আরও প্রায় সকলেই এদের সঙ্গে বিচার করিয়াছেন। আর্হতপ্রবর শ্রীহরিভদ্র সূরি বিরচিত 'ষড়্দর্শনসমুচ্চয়' নামে যে ছোট বই পাওয়া যায়, তাতে বৌদ্ধ, নৈয়ায়িক, কাপিল, জৈন, বৈশেষিক এবং জৈমিনীয়—এই ছয়খানি দর্শন ধরা হইয়াছে। এদের কোন কোনটা হিন্দু দর্শনগুলির দৃষ্টিতে নাস্তিক, কিনা, বেদের প্রামাণ্য মানে না। যাই হোক্, হিন্দু দর্শনগুলি সবাই বেদ মানিয়াছেন— যে বেদ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য বলিতেছেন— "রবেরিব রূপবিষয়ে প্রামাণ্যম্"। উদয়নাচার্যও 'কুসুমাঞ্জলি'তে স্মৃতি তুলিয়া দিয়াছেন— "আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ। ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্।।" প্রজ্ঞা কিনা, প্রকৃষ্টরূপে জানা, এই তিন উপায়ে পাইতে হইবে। আন্বীক্ষিকী বা ন্যায় কথাটার মানেও তাই। শোনার পর (অনু) ঈক্ষা, কিনা, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। শেষ কালে, ধ্যানরসের দ্বারাই তৃপ্ত হ'তে হ'বে। তাই বলিতেছিলাম, গন্তব্য যখন এক এবং এক আলোতেই যখন পথ দেখিয়া চলার ব্যবস্থা, তখন চলার রাস্তা আলাদা আলাদা হইলেও, বড় বেশী তফাৎ হইবে না।

শুধু কি উদ্দেশ্যের মিল আর প্রমাণের মিল (আসল যায়গাটায়— অসাধারণ, অতীন্দ্রিয় অনুভব আছে এবং সেটা প্রমাণ কিনা, এতে মিল) দেখি? রাস্তায় চলার জন্য যাদের ডাকা হইতেছে—যা'দিকে

অধিকারী বলে— তাদের গৌণ আর মুখ্য এই দুই রকম ক্লাশে ফেলা হইত। প্রয়োজনও ঐ দুই রকমের। ন্যায়শাস্ত্র কেন পড়িব? জিজ্ঞাসা করিলে, সোজা উত্তর,—এতে বুদ্ধিবৃত্তির বেশ মার্জনা হয়; আমরা কেমন করিয়া প্রত্যক্ষ করি, অনুমান করি, শব্দ শুনিয়া তার অর্থ বুঝি, এ সব ব্যাপার বেশ ভালমতে বুঝা যায়; ভালমতে বুঝিলে, সে সব ব্যাপারে ভুলের সম্ভাবনা কম হয়; আর, আমাদের জীবনের সকল রকম ব্যবহারই যখন এই সব ব্যাপার (প্রত্যক্ষ-অনুমানাদি) লইয়া হইতেছে, তখন এটা ঠিক যে, এগুলো ঠিক ভাবে হইলে, ব্যবহারও ঠিক হইবে; আর ব্যবহার ঠিক হইলেই আমাদের লাভ। লাভ মানেই উন্নতি, অভ্যুদয়। এইটে গেল গৌণ প্রয়োজন।

আর, লাভ যদি পরম লাভ— সকল দুঃখের অবসান— মুক্তি হয়, তবে ত' কথাই নেই। সেইটে মুখ্য প্রয়োজন। পরম লাভে যার অভিলাষ এখনও হয় নাই? সে ছোটখাটো (ব্যাবহারিক) লাভের জন্যই ন্যায় পড়ুক। সে গৌণ অধিকারী। এই গৌণ অধিকারীরাই দলে পূরো। পশ্চিম দেশেও এসব "Discipline"এর "Values" বা লাভের কথা যে না শুনিতে পাওয়া যায়, এমন নয়। কিন্তু পরম লাভের কথা কেউ বড় একটা বলেন না। অনেকে বলেন—নিষ্কাম ভাবে সত্যকে অন্বেষণ করা, এবং যতটা পারা যায়, জানাই পরম লাভ। অন্য কিছু লাভ অবান্তর ব্যাপার। উচ্চ গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতির শেষ আলোচনা ও পরীক্ষাগুলিতে ফল কি হইবে জানি না; ফলের আশা না রাখিয়া এবং সে জেরা না তুলিয়াই আলোচনা ও পরীক্ষা আবশ্যক। একটা নিষ্কাম নিরপেক্ষ উন্মুক্ত ভাব না থাকিলে ফল আর লাভের দিকে নজর থাকিলে, সত্যই ঠিকভাবে জানা যায় না। শুধু গণিত বলিয়া নয়, দর্শন শাস্ত্রেও এই নিষ্কাম, নিরপেক্ষ ভাব লইয়া নামিতে হইবে। তা যদি হয় ত'—যাঁর সে ভাব আছে, তিনিই মুখ্য অধিকারী। অনেকেরই সে ভাব নেই। তাঁরা লাভের অঙ্কের পানে তাকাবেনই। এঁরা

গৌণ অধিকারী। পশ্চিমদেশে সত্যকে সত্য করিয়া জানাই পরমলাভ,—এমতের লোক (যেমন, বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর Our knowledge of the external world গ্রন্থে) অবশ্যই আছেন; কিন্তু অন্য রকম লাভ (values) এর কথাও অনেকে না ভাবিয়া পারেন নি। তবে, ঐ যা বলিলাম, ফিলসফি পড়িব মুক্তির জন্য—এত বড় কথাটা প্রাচীনকালে প্লেটো অথবা আধুনিক যুগে স্পিনোজা বা আর কেউ কেউ ভাবিয়া গেলেও, অনেকেই লাভের অঙ্ক অত বড় করিয়া দেখিতে ভরসা পান নি।

ন্যায়দর্শন লজিক বটে, কিন্তু সেখানেও দেখি "তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ"—এইটেই হইল মুখ্য প্রয়োজন। ন্যায়সূত্রের ওপর উদ্‌দ্যোতকর বার্তিক লেখেন, তার ওপর বাচস্পতিমিশ্র তাৎপর্য টীকা লেখেন; তার ওপর উদয়নাচার্য তাৎপর্যপরিশুদ্ধি টীকা লেখেন। তাতে তিনি শঙ্করাচার্যাদির মতন, শমদমাদি সম্পত্তি, নিত্যানিত্য বিবেক, ঐহিকামুষ্মিক ভোগবৈরাগ্য এবং মুমুক্ষুতা, এই চারিটিকে, মুখ্যফল পাবার জন্য যে ব্যক্তি ন্যায়দর্শন পড়িবে তার গুণ হওয়া চাই, বলিয়াছেন। "যস্ত্বনধিকার্যের প্রবর্ততে কর্মকাণ্ড এব ব্রহ্মকাণ্ডে স ন ফলভাগ্ ভবতি"—অনধিকারী হইয়া যে পড়িবে, তার সেই পরম লাভটি হইবে না। অন্য লাভ হওয়ায় বাধা নেই। তবে, ঐ সমস্ত গুণের বদলে যদি দোষ থাকে, সে বিদ্যা ভয়ঙ্করী হবার কথা। ন্যায় পড়িয়া অনেকের সে রকমের "বিদ্যা"ও হইতে দেখা গিয়াছে।

এটা লক্ষ্য করার জিনিষ যে, পশ্চিমের আচার্যেরা যে নিষ্কাম, নিরপেক্ষ ভাবের কথা বলিলেন, এদেশী "সাধন-চতুষ্টয়ের" মধ্যে ("শমদম," "বৈরাগ্য" ইত্যাদিতে) সে ভাব খুবই বজায় রাখার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে— বিবিদিষা বা জিজ্ঞাসার সঙ্গে—মুমুক্ষুতাও আছে। থাকায় হানি কি— যদি তাতে ক'রে সত্যের অন্বেষণে ও গ্রহণে কোনওরূপ কুণ্ঠা, পক্ষপাত না থাকে; "অপ্রিয়"

সত্য দেখিব না, "প্রিয়" উপাদেয় সত্যই লইব— এ রকমের মনোভাব স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে পশ্চাতে না থাকে।

নিরপেক্ষ হ'ব বলিলেই কি নিরপেক্ষ— ফলাভিসন্ধানলেশশূন্য হওয়া যায়? একটা কিছু ফলের প্রয়োজন প্রচ্ছন্নভাবে ভেতরে থাকে। যিনি সত্যকে সত্যভাবে জানাই কাজ বলিতেছেন, তাঁরও সেইটাকে "কে'জো" (of value) বলিয়া বোধ আছে ; সে কাজ তাঁর ভাল লাগে ; সে কাজেই তাঁর তৃপ্তি। গণিতের উচ্চ অঙ্গগুলির অনুশীলনে অনেকে এই ভাবে "মেতে" আছেন। আত্মাকে জানিলে মুক্তি হয়— এমন না হইয়া আত্মাকে জানিলে বন্ধন আরও শক্ত হয়, এমন বুঝিয়াও হয়ত' কেহ কেহ আত্মাকে জানিতে চাইবেন। চাইবেন এইজন্য যে কোন কিছুকে খাঁটি করিয়া জানার চেষ্টাতেই তাঁদের তৃপ্তি (satisfaction) ; এমন কি, ফলে বন্ধন হইলেও তৃপ্তি। ভালবাসার বাঁধনে ধরা দিতে এবং বাঁধা থাকিতে অনেকেই চায়।

তারপর সকল কাজেরই "দাম" (value) আমাদের ভেতরটা জানিতে চায়, যাচাই করিয়া দেখিতে চায়। এতে দোষ ত' নেই-ই বরং আমাদের প্রকৃতিই বলে, যে কাজের দাম একভাবে না একভাবে নেই (moral, aesthetic or other value), সে কাজ করিবে কেন? কাজের প্রেরণা, অনেক স্থলেই একটা দাম পাবার আশা থেকেই এসে থাকে। দাম পাবার আশা তেমন নেই ব'লে আজকাল অনেকেই অধ্যাত্মবিদ্যা, দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলন থেকে স'রে পড়ছে। অন্য অন্য বিদ্যারই বাজারে কাট্‌তি বেশী। অথচ, অধ্যাত্মবিদ্যা এমন একটা বিদ্যা, যে "বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে"— অমৃত অভয় পাওয়া যায়। উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যায় এই অমৃত ও অভয়কেই বিদ্যার "দাম" বলিয়া বার বার বলা হইয়াছে। এর চাইতে বেশী দাম আর কে দিতে পারে? পশ্চিমের তত্ত্ববিদ্যা, আগে যাই হোক্, এখন আর এ "দাম" দিতে ভরসা পান না। কাজেই, সত্যকে

জানার প্রতিজ্ঞা করিয়া জনকতক লোক এ বিদ্যার সেবা করিতেছে। অনেকেই এর চাইতে বেশী "কে'জো" বিদ্যার দিকেই ঝুঁকিয়াছেন। আমাদের দেশের চতুষ্পাঠীগুলিতে তত্ত্বজ্ঞানের যে বড় একটা দাম আছে, একথা মুখে এখনও আওড়ান হয়। কিন্তু ঠিক অধিকার লইয়া আমরা পড়ুয়া হইতেছি না বলিয়া, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের যে পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি (শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন), সেটা ধরিতে পারিতেছিনা বলিয়া, কর্মকাণ্ডের মতন, ব্রহ্মকাণ্ডেও ফলভাক্ হইতেছি না। পশ্চিমদেশে মধ্যযুগের মিষ্টিসিজম বাতিল করিয়া দিবার পর হইতে তত্ত্বজ্ঞানের পদ্ধতির সিঁড়ি মাঝখানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে আধখানা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিয়া পরমলাভ (Supreme Value) এর কোনও নামগন্ধ পাওয়া যায় না। কাজেই, ওদের দর্শন-ব্যবসায়ীরা সাধারণতঃ সে লাভের কথা বড় একটা বলেন না। ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়া খানিকদূর উঠিতে পারিলেও চারধারের অবস্থাটা স্পষ্ট করিয়া, পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করিয়া বোঝার সুবিধা হইবে ; কাজেই, দৃষ্টি প্রসারিত, চিন্তা ও ভাবগুলি উদার হইবে ;—এইরকম একটা লাভের কথা তাঁরা ভাঙ্গা সিঁড়ির ওপর দাঁড়াইয়া বড় গলা করিয়া বলিতে কসুর করেন না বটে, এবং তাদের কথা ওভাবে কতকটা সত্যও বটে ; কিন্তু আশে পাশের লোক "দূর হইতে" সভয় দৃষ্টিতে সেই সিঁড়ির ভাঙ্গা ধাপ কয়টার দিকে মাঝে মাঝে তাকায়, আর প্রায় নিশ্চিন্তমনেই আপন আপন বন্দেজি জমিনে "চুটিয়ে ফসল কেটে" নেবার চেষ্টা করে। নূতন মিস্ত্রি এসে সিঁড়িটা শেষ পর্যন্ত গেঁথে না তোলা পর্যন্ত এই রকমই চলবে মনে হচ্ছে।

এদেশের মুক্তিকে মুখ্য প্রয়োজন বলা হ'য়েছে ব'লে সেই প্রয়োজনেই যেন সব আয়োজন। যাঁরা খবরদার ও সমজদার, তাঁরা কেউ বলবেন না যে, প্রয়োজনের গরজে সত্যকে সত্যভাবে, নির্ভীক, নিরীহ ও নিরপেক্ষ ভাবে— জানার চেষ্টা এদেশে হয় নাই। যেখানে বিচার বা মনন চলিয়াছে, সেখানে কখনই তাকে খাটো দড়ি দিয়া

বাঁধিয়া রাখা হয় নাই। বিচারক্ষেত্রে স্বাধীন ও নির্ভীক চিন্তার চূড়ান্ত পরিচয় এদেশের দার্শনিকেরা দিয়াছেন। ছখানি দর্শনের মধ্যে দুখানিতে ঈশ্বর স্থান পান নাই। দেহাত্মবাদ (Materalism), শূন্যবাদ (Nihilism), ক্ষণিকবাদ (Philosophy of Absolute Change)— এসবের সঙ্গেই দর্শনগুলি জীবন-মরণ পণ করিয়া লড়িয়াছেন। এমন কোনও আপত্তি (পূর্বপক্ষ), এমন কোনও বিকল্প (alternative) নেই, যা এঁরা কষিয়া মাজিয়া দেখেন নাই। যাঁরা ভাবেন "অথরিটি" (শ্রুতিস্মৃতি) এদের বুকে জাঁতার মতন চাপিয়া বসিয়া আছে; এঁদের স্বাধীন চিন্তার নিঃশ্বাস ফেলিতে দেয় নাই, কণ্ঠে অকুণ্ঠিত বাণী ফুটিতে দেয় নাই, তাঁরা বোধহয় দর্শনদুর্গগুলির পরিখা পার হইয়া ভিতরে ঢোকার চেষ্টাই তেমন করেন নাই। আগম মানা হয় বলিয়া বিচারে কোনই কসুর নেই। দুখানা মীমাংসা দর্শন ছাড়া আর চারখানা দর্শনে যুক্তির ওপরেই সব গড়িয়া তোলার যত্ন হইয়াছে। শাস্ত্র সাফাই সাক্ষ্যমাত্র— সমর্থক প্রমাণ। বেদান্তে ও মীমাংসায় ব্রহ্ম ও কর্ম সম্বন্ধে অসাধারণ প্রমাণ (Extraordinary Evidence) লইয়াই আসলে বিচার। কিন্তু বিচার বেশ চুলচেরা, নির্ভীক, গোড়া চাপিয়া ধরিয়া। আর, অসাধারণ সাক্ষ্যের দোহাই দেবার সঙ্গে সঙ্গে, যুক্তির দিক্ দিয়াও, প্রতিপাদ্য বিষয়টাকে দৃঢ় করার চেষ্টা কম হয় নাই। অসাধারণ সাক্ষ্য আদৌ মানিতে যাব কেন— তা লইয়াও সুন্দর বিচার। আমরা এ সম্পর্কে দু'চার কথা পরে বলিতেছি।

এদেশেও সিঁড়ির ওপরের ধাপ কয়টায় বহুদিন ধরিয়া বেজায় শেওলা পড়িয়াছে দেখিতেছি। মুখে মুখ্য প্রয়োজন এবং অধিকারীর কথা বলা হয়, এমন কি, পুঁথি পাড়িয়া তাই লইয়া গোড়াতে খানিকটা বিচারের কসরৎ করার দস্তুর এখনও আছে; যেমন, মঙ্গলাচরণ লইয়া। কিন্তু, কার্যতঃ, চতুষ্পাঠীগুলি এখন বুদ্ধির কসরৎ দেখানর আখড়া হইয়াছে। এ কসরতেরও দাম আছে, যদিও

বাড়াবাড়িটা ভাল নয়। বিদেশী কসরৎ ভাল, কি আমাদের দেশী কসরৎ ভাল, তা লইয়া বিচার তুলিয়া কাজ নেই। তবে, বোধহয়, বিদেশীর দল অনেক নতুন নতুন খেলা ও প্যাঁচ দেখাইতে পারেন; তাঁদের সায়েন্স প্রভৃতি এ সব তাঁদের শিখিয়েছে। এদেশের সেই মামুলি প্যাঁচগুলোই চলছে বেশী— কিন্তু সে প্যাঁচগুলো একেবারে "যুযুৎসু"— মারাত্মক। ক'শ' বছর আগে, প্রধানতঃ গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের 'তত্ত্ব-চিন্তামণি' বেরোনোর পর থেকে, একরকম সাংঘাতিক প্যাঁচ আবিষ্কার হ'য়েছে। তাকে বলে, নব্যন্যায়। উচ্চ গণিতের চাইতেও শক্ত এর সব পরিভাষা। শক্ত হ'লেও দরকারি— কাটেও ভাল, কাটানো যায়ও ভাল। বেদান্তাদি দর্শনও পরে এই নতুন হাতিয়ার নিয়ে কসরৎ ক'র্‌তে আরম্ভ ক'রেছে। গণিতের টেক্‌নিকালিটিস্‌গুলির দাম আছে; এদেরও আছে। আইন্‌ষ্টাইন্‌ গতিবিজ্ঞানের ফরমূলাগুলো সামান্য একটু আধ্‌টু সংশোধন ক'রে দিচ্ছেন। কার্যতঃ, সে নগণ্য সংশোধনে কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু সংশোধন সংশোধনই। নব্যন্যায়াদিতে আগেকার প্রমাণ-প্রমেয়াদির লক্ষণগুলি পরীক্ষা করিয়া তাদের নূতন আকৃতি দেওয়া হইয়াছে। 'তত্ত্বচিন্তামণি' ব্যাপ্তি প্রভৃতির যে লক্ষণ দিয়াছিলেন, পরবর্তী নৈয়ায়িকেরা, বিশেষতঃ আমাদের বাংলা দেশের নৈয়ায়িকেরা, সে লক্ষণ চাঁছিয়া ছুলিয়া আরও পরিষ্কৃত করিয়াছেন। এখানে নমুনা দেব না। তবে উচ্চ গণিত যদি মস্তিষ্কের অপব্যবহার না হয়, তবে, নব্যন্যায়ও নয়। বরং বিচারমূলক সকল রকম ব্যবহার-ক্ষেত্রেই নব্যন্যায়ের সংশোধন পরিমার্জনগুলি কাজে খাটানো যেতে পারে। দার্শনিক বিচারে ত' বটেই।

অধিকারীর কথাও ওদেশে তেমন কেউ বলিতে সাহস করে না। ডিমোক্রাসীর দেশ কি না! সব্বাই যে সমান। কিন্তু, এক্ষেত্রে অন্ততঃ, সব্বাই ত' সমান নয়। রুচিতে নয়, সংস্কারে নয়, শিক্ষায় নয়, প্রতিভায় নয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দোষগুণেও নয়।

দর্শনের অনুশীলনে রুচি, সংস্কার, শিক্ষা-দীক্ষা, প্রতিভা বা মেধা, নৈতিক দোষগুণ (রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি)—এ সকল কি অবান্তর? উপেক্ষার জিনিষ? ওদেশে প্লেটো প্রভৃতি এবং মধ্যযুগে মিষ্টিকরা কি বাজে কথা বলিয়াছেন?

তত্ত্বজ্ঞান উদ্দেশ্য। যে জানিবে, যা লইয়া এবং যেভাবে জানিতে চাহিবে, তার সঙ্গে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্বন্ধ নেই, এমন কি হইতে পারে? তত্ত্ব না হয় প্রমেয় বা জ্ঞেয়। কিন্তু যে প্রমাতা এবং যেটি প্রমাণ, সে এবং সেটি, প্রমেয়টাকে যথার্থভাবে জানার পক্ষে উপযুক্ত হবার দরকার নেই? সকলের সকলটায় কি রুচি আছে; সকলটা বোঝার শক্তি বা প্রতিভা আছে; সকলটায় অপক্ষপাত করার মত উদার উন্মুক্ত ভাব আছে? তা নেই, কাজেই অধিকারী চাই।

অধিকারী মুখ্য আর গৌণ—তা আমরা দেখিয়াছি। সোজাসুজি মোক্ষের জন্য দর্শনের অনুশীলন যে করিতে আসে নাই, কাজেই, সে ভাবে অনুশীলন করিতে গেলে যে "সাধন-চতুষ্টয়" থাকা আবশ্যক, তা যার তাদৃশ নাই, সে হইতেছে গৌণ অধিকারী। দর্শনের প্রতিপাদ্য যে বিষয়, তা জানিবার যার আগ্রহ আছে, সুতরাং জানিতে যার ভাল লাগে; আপনার বিচারশক্তি, চিন্তাশক্তি এ সবের উৎকর্ষ করা যার কামনা; আর সেই "মাজা ঘষা" বুদ্ধি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে ফলবান্ হইতে পারা যাইবে, এ যার বিশ্বাস;—সে-ই দার্শনিক আলোচনার সাধারণ বা গৌণ অধিকারী। মুমুক্ষুতা প্রভৃতি সাধনচতুষ্টয় সকলের ভেতরে সমান থাকে না। কাজেই, মুখ্য অধিকারীরাও সব্বাই এক কোঠায় পড়িবে না। গৌণ অধিকারীরাও পড়ে না।

দুঃখের নিবৃত্তি অবশ্য সব্বাই চায়। উপায়ের কথাও এক না এক ভাবে সব্বাই শুনেছে। কিন্তু তা হইলেও, কি করিলে দুঃখ একেবারে যায়, তা সব্বাই সমান বোঝে নাই। খাঁটি উপায়টা পেতে ও ধর্তে সব্বাইকার "আবেগ" সমান তীব্র নয়। এইজন্য, যোগশাস্ত্রে মৃদু,

মধ্য, অধিমাত্র— তিন রকম অধিকারীর কথা আছে। যাদের "তীব্র সম্বেগ," তাদেরি সিদ্ধি "আসন্ন।" যাঁদের সম্বেগ এসেছে, আর উপায় সম্বন্ধে বোঝারও কোন গোল নেই, তাঁরা "এটা সেটা" জানার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে, সোজাসুজি আত্মাকেই চেপে ধর্‌তে চাইবেন। এঁরা বেদান্ত বা উপনিষৎ, অথবা "প্রস্থানত্রয়"— ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ এবং গীতা— এতেই ডুব দেবেন। এঁদের অবস্থাবিশেষে, মনন করার দরকার আছে, আবার অবস্থাবিশেষে নেইও। ধ্যান বা সমাধির সংস্কার এতটা দৃঢ় হ'য়েছে, সুতরাং নির্মল, সত্য, একতান চিন্তা এঁদের এতটা অভ্যস্ত হ'য়েছে যে, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই রকমের "মহাবাক্য' শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সাক্ষাৎ আত্মজ্ঞান হ'বে। হাতে একটা মণি নিয়ে ভুলে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কোথা সে মণি ; কেউ ব'লে দিল—"ঐ যে হাতেই মণি র'য়েছে।" যেই কথাটা শোনা, আর সঙ্গে সঙ্গেই ভূল ভেঙ্গে যাওয়া— হাতেই মণি পেলাম। "হস্তামলকবৎ"— হাতের মুঠোয় আমলকীর মতন। যাদের সমাধি-সংস্কার তেমন দৃঢ় হয়নি, সংশয়াদির লেশও আছে, তাদের মননাদি করারও দরকার থাকে। ক্লাশ হিসাবে এঁরা "অন্তশ্চেতা"—আত্মরসিক। বাইরটা ভুলে আত্মাতেই ডুব দেন। আর, বাইরটাকে আত্মারই "স্বপ্ন" বা "বিলাস" এইরকম একটা কিছু ভাবেন। হয় বিবর্ত (মিথ্যা), নয়ত' পরিণাম বা অংশ (সত্য)। কিন্তু আত্মারই। ঠিক নিজের আত্মারই না হলেও, পরমাত্মার। এক কথায়, এঁরা "জগদ্ ভোলা"র দল। মিথ্যে স্বপ্ন মনে ক'রে ভোলা ; অথবা, বিকার (স্বভাব নয়), অংশ (পূর্ণ নয়), রচনা (কাজেই স্বতন্ত্র নয়)— এ রকম ক'রেও ভোলা। এঁরা বেদান্ত নিয়ে থাক্‌বেন।

কিন্তু জগৎটাকে ভোলা শক্ত। আমি জান্‌ছি, জেনে সুখ-দুঃখ পাচ্ছি— এই একটা দিক্— আত্মার দিক্। বিরাট্, অসীম, বিচিত্র একটা কিছু, নানা রকমে, আমার সঙ্গে কারবার ক'র্‌ছে। এটা

জগৎ। আমি দেখি, সে আমায় দেখায়। এ দুয়ের কোনটাকেই ভোলার যো নেই। এটাকে ওটার বিকার, অংশ বা রচনা মনে কর্তে বাধে। দুটোই আছে; নিজের সত্ত্বে, স্বতন্ত্র ভাবে, আছে, অথচ, মিলেমিশে কারবার করে। কারবারে একজনের ঘাড়ে (আত্মায় বা পুরুষে) পরের বোঝা (সুখ-দুঃখাদি) চেপে বসে। এটা মিথ্যে বোঝা; অ-বোঝার বোঝা। এ অবোঝার বোঝা বুঝে সুজে ঝেড়ে ফেল্‌তে পার্‌লেই গোল মিট্‌ল। কিন্তু তখন যে যার ন্যায্য "পাওনা গণ্ডা" বুঝে নিয়ে কারবার বন্ধ করে মাত্র। কেউ বাতিল, ফৌত হ'য়ে যায় না। এ মামলায় অধিকারী "অন্তশ্চেতা" বটে, "আত্মরসিক" হ'তেও চান বটে; কিন্তু অনাত্ম-বস্তুকে অনঙ্গীকার করতে চাইলেও অস্বীকার করতে পারেন না। আত্মার "ভূত" ছাড়ান বটে, কিন্তু ভূত আত্মাতেই মিলিয়ে যায় না— পালায়। এ ভূতছাড়ানো কাজটা যে শক্ত, তা সাংখ্যশাস্ত্র আর তার সাধনের দিক্— অষ্টাঙ্গযোগ— আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন। তাড়াবার জন্যেও অনাত্মায় (প্রকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতি, বিকৃতি) যথেষ্ট খেয়াল রাখ্‌তে হয় ব'লে, এ থাকের অধিকারে চিন্তা ঠিক "আত্মস্থ" নয়, "অন্তর্বহির্লেলায়তে"— আত্মায় অনাত্মায় খেলে বেড়ায়। বেদান্তে আত্মা বা ব্রহ্মের স্বরূপ নিয়ে যে সমস্ত শ্রুতি আছে, সে সকলে মনঃ-সংযোগই আসল কাজ। সে স্বরূপটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই জগৎটা তাতে, স্বপ্নভাবেই হোক্ আর অংশ ভাবেই হোক্, মিলিয়ে যাচ্ছে। সেটাকে আলাদা ক'রে ভেঙ্গে চুরে দেখা অনেকটা অবান্তর ব্যাপার। মূলে অনির্বচনীয় সৃষ্টি, যে সমস্ত সৃষ্ট হ'ল,— এসব বেদান্তে আসল নয়। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"— যা থেকে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হচ্ছে, সেইটেই আসল। সাংখ্যে, যা থেকে সৃষ্ট্যাদি হচ্ছে, সেটা আসল বটে; কিন্তু সেটা, যেটা সেটাকে জান্‌ছে, প্রকাশ করছে, তা থেকে আলাদা। সে আলাদা জিনিসটাও আর একটা আসল। এই দুই আসলেরই হিসেব নিতে হবে।

আর এক থাক্‌ নেমে এসে দেখি, বাইরটাই আসল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা সচরাচর যেমনটা মনে করি। অনেক জিনিস, তার ভেতর আমিও একটা। আমিই কর্তা, আমা হ'তেই সব— এমন মনে হয় না। বাইরটে এত বড়; তার তুলনায় আমি কতটুকু, কতক্ষণ! ন্যায়বৈশেষিক বাইরটার সঙ্গে "আমাকে"ও পরীক্ষা করলেন। বাহিরটা বড়, তাতে অনেক জিনিস; কাজেই, সেটাকেই বেশী ক'রে; আমাকে "দশের একজন" ক'রে। পরীক্ষার ফলে অবিশ্যি আমার অনেক ভুল গেল ঃ— আমি "এতটুকু" নই, বড়ই (বিভু); "কতক্ষণ আছি" নয়, নিত্য। আমি দেহ নই, ইন্দ্রিয় নই, মন নই। আর, আমার মতন, কিন্তু আমার চাইতে জ্ঞানে ও শক্তিতে অনেক বড়, একজন কেউ আছেন (পরমাত্মা, ঈশ্বর), যিনি বাইরের উপাদানগুলো (পরমাণু, আকাশ, দিক্‌, কাল) তৈরি করেন না, আমাকেও (মন আর আত্মাকে) তৈরি করেন না বটে; কিন্তু এদের "অদৃষ্ট" ব'লে একটা কিছু আছে, সেইটেকে নিয়ে, নিজের যত্নে এই বিশ্বের উপকরণগুলো নিয়ে ভাঙ্গা-যোড়া করেন— সৃষ্টি ও লয় করেন। কথাগুলো পরে আরও পরিষ্কার হবে। তবে, দেখ্‌ছি, আত্মা ছাড়া জিনিসগুলো নিয়ে পরীক্ষা করার দরকার এখানে খুবই বেশী। সে রকম পরীক্ষাতেই আত্মাকে ঠিক ঠিক জান্‌তে পারা যাবে। বলা বাহুল্য, আমরা সচরাচর এ রকম ধারাই ভেবে থাকি, আর, ভাবনার এইরকম রাস্তা ধ'রে চলতেই প্রস্তুত আছি।

কাজেই দেখ্‌ছি—আমাদের ভেতরকার অবস্থা অনুসারেই তিন রকম "দৃষ্টি" (standpoint), সুতরাং অধিকার হ'য়ে র'য়েছে। তিন রকমের অধিকার বুঝে তিন রকমের দর্শন। ভেতরকার অবস্থা (বুদ্ধির ও চরিত্রের-intellectual and moral) যেমন যেমন এগিয়ে আসবে, তেম্‌নি তেম্‌নি এক থাকের দর্শন অতিক্রম ক'রে আমরা উঁচু থাকে উঠ্‌তে থাক্‌ব। অবস্থাবিশেষে দৃষ্টি ও রুচির

তারতম্য হিসাবে, আলাদা প্রস্থান। নইলে উঁচু নীচু কেউ নয়। প্রত্যেকেই শেষের ধাপে তুলে দেবার যত্ন ক'রেছে। ভেতরকার অবস্থা বুদ্ধির দিক্ দিয়ে—স্বাভাবিক মেধা, প্রতিভা, অন্তর্দৃষ্টির দিক দিয়ে, হ'তে পারে। নীতি সাধনের উৎকর্ষ-অপকর্ষের দিক্ দিয়ে (শম দমাদি কতটা আছে না আছে, রাগদ্বেষাদি কতটা আছে না আছে ইত্যাদি) হ'তে পারে। আবার, আধ্যাত্মিক বিভূতির দিক্ দিয়ে (ধ্যানধারণাদি দ্বারা অতীন্দ্রিয়, অসাধারণ জ্ঞান পাবার যোগ্যতা কতটা হ'য়েছে না হ'য়েছে) হ'তে পারে। পূর্বমীমাংসা দর্শন-খানাকে থাকে ফেল্লাম না। ধর্ম (লৌকিক ও বৈদিক) নিয়ে এতে বিচার; কর্মের পেছনে যে লৌকিক ও বৈদিক প্রেরণা (sanctions) গুলি র'য়েছে, তাদের উদ্দেশ্য স্বরূপ, সম্বন্ধ ইত্যাদির বিচার—ব্যবহারের দিক্ দিয়ে (practical) প্রয়োজনটাই বেশী। প্রসঙ্গতঃ প্রমাণ, আত্মতত্ত্বাদিরও বিচার আছে। তিন থাকের দর্শনের ভেতরই বিধি-নিষেধের আর সে সবের ফলের একটা দিক্ আছে। কাজেই পূর্বমীমাংসা তিন থাকেরই সঙ্গে জড়িত।

আমরা দেখেছি যে, আস্তিকদর্শনগুলি সবাই শ্রুতির ও স্মৃতির প্রামাণ্য মেনে চলে। শুধু মেনে চলে এমন নয়, সেই প্রামাণ্যকে সব চাইতে বলবৎ মনে করে। আমরা ন্যায়-বৈশেষিককে প্রথম প্রস্থানের দর্শন বলিতেছি। সাংখ্যপাতঞ্জল দ্বিতীয় প্রস্থান। আর বেদান্ত তৃতীয় ও চরম প্রস্থান। যুক্তি এবং শাস্ত্র ("অথরিটি") দুই দিয়ে তত্ত্বনিশ্চয় করা হইয়াছে তিন প্রস্থানেই। তার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্থান যুক্তিপ্রধান, বেদান্ত শ্রুতি বা শাস্ত্রপ্রধান। বেদান্ত-সূত্রের গোড়াতেই (১।১।৩) "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এবং (১।১।৪) "তত্তু সমন্বয়াৎ" এই দুই সূত্রে ব্রহ্মকে বা আত্মাকে যে শাস্ত্র দ্বারা জানিতে হইবে, এটা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। শঙ্করাচার্যাদির মতন "শাস্ত্র হইয়াছে যোনি, কিনা, কারণ যার", অথবা "শাস্ত্রের যোনি যাহা"—যেভাবেই ধরা যাক্ না কেন, শাস্ত্র হইতেই শুনিতে ও

—৫

জানিতে হইবে ব্রহ্ম কি, আত্মা কি। প্রথম প্রস্থানের দর্শন যে বৈশেষিক তাতেও 'তদ্‌বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্'' (১।১।৩)—ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া, অথবা ধর্মপ্রতিপাদক বলিয়া, আম্নায় বা বেদের প্রামাণ্য মানা হইয়াছে। শঙ্করমিশ্র প্রভৃতি টীকাকারেরা নানা সংশয় তুলিয়া তার সমাধান করিয়া দেখাইতে যত্ন করিয়াছেন—কেন বেদ মানিব। ঋগ্‌বেদভাষ্যের এবং অথর্ববেদভাষ্যের অনুক্রমণিকায় সায়ণাচার্য বেদের প্রামাণ্য বা স্বতঃপ্রামাণ্য নিয়া বিস্তারিত বিচার করিয়াছেন। "বেদস্য স্বতঃপ্রামাণ্যং চোদনাসূত্রে আচার্যৈরেবোপপাদিতম্। তত্র বহুধা বিবদন্তে বাদিনঃ।"...... ইত্যাদি। সকল দর্শনেই অল্পবিস্তর বিচার আছে। নাস্তিকপক্ষ, অর্থাৎ যাঁরা বেদ মানেন না, তাঁরা যে সব আপত্তি আনিতেন (বেদে পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্য আছে, অর্থহীন এবং নিষ্ফল বাক্য আছে, তুচ্ছ কথা আছে, অসম্ভব কথা, অপ্রসিদ্ধ কথা আছে, পুনরুক্তি আছে, ইত্যাদি) সে সকলের সমাধান আস্তিক দর্শনগুলি করার যত্ন করিয়াছেন। বেদ ঈশ্বরবাক্য, আর বেদ অপৌরুষেয় (অনাদি, কারুর দ্বারা রচিত নয়; ঈশ্বর সৃষ্টির গোড়ায় বেদ "স্মরণ" করেন মাত্র)—এ দুই রকম করিয়া আস্তিকদর্শনগুলি বেদের কথা বলিয়াছেন।

পূর্বমীমাংসার গোড়ায় দ্বিতীয় সূত্রের ওপর শবরভাষ্যে ("ন চৈষ কালান্তরে পুরুষান্তরে, অবস্থান্তরে, দেশান্তরে বা বিপর্যেতি। তস্মাদবিতথঃ।" ইত্যাদি); তার ওপর কুমারিলভট্ট যে বার্তিক রচনা করেন, তাতে, ("পৌরুষেয়ে দ্বয়ং দৃষ্টং দোষাভাবো গুণাস্তথা ৬৪...ইত্যাদি), এবং আরও নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধে বেদকে অপৌরুষেয় (অথবা, অন্যরকমে, সর্বজ্ঞপুরুষরচিত) দেখাবার যে সমস্ত যুক্তি দেখানো হইয়াছে, আমরা এখানে সে সমস্তের সার সঙ্কলন করার চেষ্টা করিব না। যুক্তিপটলের কেন্দ্রস্থলে যে কথাটী রহিয়াছে, তা এই :—আমরা সাধারণ প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা জান্‌তে পারিনে, অথচ সত্য, এমন সব কথা বেদের মুখে শুন্‌তে পাই। সত্য যে

তা কাজ ক'রে ফলের দ্বারা বুঝি ; অথবা সাধনালব্ধ নিজের নিজের অনুভূতি দিয়েও বুঝি। যাঁরা "আপ্ত" কিনা বিশ্বস্ত পাত্র, তাঁরাও সাক্ষ্য দিচ্ছেন—আমরা ফল পেয়েছি, নিজের অনুভূতি দিয়ে সবটা না হোক্, কতকটা যাচাই করে নিয়েছি। এই যে সত্যজ্ঞানসমষ্টি, এটা যে কোনও ব্যক্তি কোনও দিন প্রথম পেয়েছেন, এবং পেয়ে তা চালিয়ে দিয়েছেন ;—এমন মনে হয় না ; কেউ গোড়া স্মরণ কর্‌তেও পারে না। কাজেই মনে হয়—ঐ রকম একটা নিত্য সত্য জ্ঞানসমষ্টি র'য়েছে এবং কোন না কোন আকারে চ'লে আস্‌ছে। আমরা নিজেদের সাধারণ প্রত্যক্ষাদি দিয়ে সেটাকে যাচাই ক'রে নিতে না পার্‌লেও, সেটা সত্য। কথাটার আর একটু-খানি আলোচনা আমরা পূর্ব ও উত্তর মীমাংসার বেলায় কর্‌ব ; এখানে অল্প কথায় একটা আভাস দিতে চেষ্টা কর্‌ছি।

পাড়াগেঁয়ে লোক, টেলিফোন কখনও দেখিনি বা শুনিনি। ক'লকাতায় এক আফিসে গেলাম, সেখানে টেলিফোন আছে। আমি এমনি কিছুই কাণে শুন্‌ছিনে। একটা চোঙ কাণে দিলে যে দূরের লোকের কথা শোনা যায়, এটা বিশ্বাস করিনে। কিন্তু চোঙ্ কাণে দিয়ে সত্যিই শুন্‌তে পেলাম। খোঁজ নিয়ে জান্‌লাম—সত্যিই একজন দূর থেকে কথা ক'য়েছে। টেলিফোনে শোনা কথা মত কাজ ক'রে ফলও পেলাম। অথচ, এম্‌নি কাণে (চোঙ না লাগিয়ে) কিছুই শুনিনে। অনেকদূরের আওয়াজ সরু নিরেট তারের মধ্যি দিয়ে যে কি ক'রে আসে, তাও বুঝিনে। বেতার, গ্রামোফোন, বায়োস্কোপ, "টকি"—সবই আশ্চর্য ; অথচ সত্য। কাজেই আমার চল্‌তি প্রত্যক্ষ অনুমানের বাইরে একটা সত্য বিদ্যা রয়েছে, যেটাকে সায়েন্স ব'লে আমরা মান্‌ছি। না মেনে পারি কৈ ? আমাদের অনুমান, আন্দাজ—এ সব যতই নিখুঁত হোক্ দেখা-শোনায় পাওয়া উপকরণের (data) ওপর নির্ভর করে। আমাদের চল্‌তি দেখা-শোনার ত্রুটি আছে। সব দেখ্‌তে শুন্‌তে পাই না ; শুধু তাই নয়, যা

দেখি শুনি, তাতেও ভুলভ্রান্তি হয়। সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট জিনিস বা ব্যাপার—সূক্ষ্মতা ইত্যাদির একটা সীমা ছাড়িয়ে গেলেই—আর আমরা দেখি শুনি না। আবার অন্ধকারে দড়িকে সাপও মনে হয়। পৃথিবীটা গোল কিন্তু সমতল মনে হচ্ছে। সূর্যই ঘুর্‌ছে মনে হচ্ছে। এ সব ভ্রম।

বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি দিয়ে, এই দুই দফা দোষই সেরে নিতে চেষ্টা করে। অনেক সূক্ষ্ম জিনিস দেখায় শোনায়, ইত্যাদি। যাতে যা হবে বলে, তা ক'রে ফল পাই। সফলপ্রবৃত্তি, এই গুণ তাতে দেখা যায়। এজন্য তার কথা সত্য বা "প্রমা" মনে করি। একখানা ফিজিক্স বা কেমেষ্ট্রির প্রামাণিক গ্রন্থ হাতে ক'রে আমার কি মনে হয়? এতে যে সব কথা লেখা আছে, তার অধিকাংশই আমার সাধারণ, আট-পৌরে অভিজ্ঞতার বাইরে। কিন্তু সত্য। আমার চল্‌তি অভিজ্ঞতার সঙ্গে না মিল্‌লেও সত্য। উল্টো হ'লেও সত্য।—যেমন, পৃথিবীই ঘুরছে, সূর্য স্থির আছে। সত্য কেন মনে করি? অপরে—যাঁরা বিশ্বস্ত ব্যক্তি—উপযুক্ত উপায়ে পরীক্ষাদি ক'রে সে সত্য পেয়েছেন; আর, নিজেও সে উপায়ে পেতে পারি। না বুঝ্‌লেও তাঁদের কথা-মত কাজ ক'রে ফল পাই; যেমন বেতারের "রহস্য" হয়ত বুঝ্‌তে পারি না, কিন্তু একটা রেডিও যন্ত্র তাঁদের কথা মত বানিয়ে অথবা কিনে নিয়ে, আমি হাজার মাইল দূরের গান বা বক্তৃতা শুন্‌তে পাই। বিজ্ঞানের বইখানা এভাবে, "আপ্তবাক্য"। কিন্তু দেখ্‌ছি, বিজ্ঞান চরম নয়। ক্রমেই এগুচ্ছে। বিশ ত্রিশ বছর আগে রেডিও শুন্‌তে পাইনি, এখনকার মতন স্বচ্ছন্দে আকাশে উড়তে পারিনি। আবার, বিশ ত্রিশ বছরের পরে যে কি হবে তা কে জানে? বিজ্ঞান পূর্ণজ্ঞান নয়, একে বারে অকাট্য, অভ্রান্ত নয়। তা ছাড়া, আজকাল বিজ্ঞান একদিকে বেশ খুলেছে বটে, কিন্তু অন্যদিকে (যেদিক্‌টার "অসাধারণ" পরীক্ষা উপনিষদাদিতে, যোগতন্ত্রাদিতে দেখ্‌তে পাই) তেমন খোলে নাই। মানুষের ভেতরটা সম্বন্ধে, অনেক রকম ধর্মানুষ্ঠান (মন্ত্র-তন্ত্র, যজ্ঞ-

হোম ইত্যাদি), পরলোক প্রভৃতি বিষয়ে এখনও চল্‌তি অভিজ্ঞতার পুঁজি ধ'রেই আমরা প'ড়ে আছি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের পুঁজিটাকে আমরা "মেকি" সাব্যস্ত ক'রে রেখেছি। কিন্তু সত্যই কি মেকি?

ফল কথা, এখনকার বিজ্ঞান পূর্ণজ্ঞান নয়, এমন কি হয়ত তার আসলটাও নয়। আমরা না জান্‌লেও, অথবা ভুল করে জান্‌লেও যেমন একটা সত্যিকার জ্ঞাতব্য (জগৎ) ঠিকভাবে আছে মনে করি, তেম্‌নি আমাদের, এমন কি বিজ্ঞানের ও যোগীদেরও, জ্ঞান অসম্পূর্ণ এবং অল্পবিস্তর ভ্রান্ত হ'লেও, একটা নিরতিশয়রূপে পূর্ণ ও সত্য জ্ঞান থাক্‌লে থাক্‌তে পারে। সে জ্ঞানের যদি কেউ মালিক ("তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্"—পাতঞ্জল সূত্র, ১।২৫) থাকেন, এবং তাঁহ'তেই আর সকলে জ্ঞান পেয়ে থাকেন ("স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ"—ঐ, ১।২৬), ত' ভালই। যদি না থাকেন, তা হ'লেও, একটা সত্য ও পূর্ণ বিদ্যা বিদ্যাভাবেই থাকিতে পারে। বিজ্ঞানের জ্ঞান, যোগীদের জ্ঞান, আমাদের জ্ঞান সবই, পূর্ণ, সত্য জ্ঞানের এক টুকরা আংশিক দখল ; কারুর বেশী, কারুর কম। সেই পূর্ণ জ্ঞানই বেদ। এইটেই বেদের মুখ্য অর্থ। এটা অসীম অনন্ত জ্ঞান। কোনও সসীম "পাত্রে" বা আধারে এর সবটা ধরা যায় না। ঋষিরাও এর সবটা ধরিতে পারেন নি। যতটা ধরিতে পারিয়াছেন, তার আবার খানিকটা নিয়েই বেদের পুঁথি। সাধারণ অভিজ্ঞতা, বৈজ্ঞানিক ও যোগীদের অভিজ্ঞতার চাইতেও, এ বেদ বড় ও খাঁটি হইতে পারে। সত্যই তাই কিনা, সেটা পরীক্ষায় ঠিক কর্‌তে হবে—is a question of fact। ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব এগুলি গৌণ অর্থে বেদ হ'লেও বড় গোছের প্রমাণ। সংক্ষেপে কথাটা এই। আমরা মীমাংসার আলোচনায় কথাটা আবার তুল্‌ব। লৌকিক প্রত্যক্ষ, বিজ্ঞান ও যোগের প্রত্যক্ষ, স্মৃতি—এ সকলের সম্বন্ধ ভেবে দেখব। মনে রাখতে হবে, প্রাচীনেরা বেদকে প্রত্যক্ষ বলতেন—It was regarded as the Standard Experience or Classics of Experience.

দ্বিতীয় অধ্যায়

ন্যায়-বৈশেষিক

আমরা ন্যায় আর বৈশেষিক, এ দুয়ের কথা একসঙ্গে বলিতেছি। কেন না, এ দুয়ের অমিল চাইতে মিলটাই অনেক বেশী। আর, মোটামুটি, গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের 'তত্বচিন্তামণি' লেখার পর থেকে "নব্য-ন্যায়" বলিয়া যে বিদ্যাটার অনুশীলন, কিছুদিন মিথিলায়, তারপর বিশেষভাবে আমাদের এই বাংলা দেশে চলিয়াছে, তাতে অক্ষপাদ গৌতমের চিন্তাধারা আর কণাদের চিন্তাধারা দুই-ই গঙ্গা-যমুনার মতন মিলিয়াছে, দেখি। ন্যায়দর্শনের প্রথমসূত্রে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান—এই ষোল পদার্থের "তত্ত্বজ্ঞানে" নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি হয়, এই বলিয়া শাস্ত্রারম্ভ করা হইয়াছে। এর মধ্যে "প্রমেয়" টাকে বাদ রাখিলে, আর সবই প্রমাণেরই কথা—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা পরম্পরা সম্বন্ধে। যাতে যথার্থ—ঠিক ঠিক জ্ঞান হয়, তাই প্রমাণ। সেই ঠিক ঠিক ("তদ্‌বতি তৎপ্রকারকং") জ্ঞানকে প্রমা বলে। 'কুসুমাঞ্জলি', চতুর্থ স্তবকে প্রথম কারিকায় উদয়ন যে প্রমার লক্ষণ দিয়াছেন, মোটামুটি তাই ধরা যাইতে পারে—যথার্থোঽনুভবো মানমনপেক্ষতয়েষ্যতে—যথার্থ আর অনপেক্ষ (স্মৃতি বা স্মরণসাপেক্ষ নয়) অনুভবই প্রমা। বেদান্ত-পরিভাষা—প্রমাত্বমনধিগতাবাধিতার্থবিষয়জ্ঞানত্বং—বলেন। অবাধিত মানে যথার্থ, অনধিগত মানে যেটা স্মৃতি নয়, সাপেক্ষ নয়। এখন সংশয় অবশ্য প্রমাণ নয়; তর্ক, বাদ, জল্প, হেত্বাভাস, ছল ইত্যাদি আর কোনটাই প্রমাণ নয়। কিন্তু জ্ঞান যথার্থ হইল কি না হইল,

তা ঠিক করিতে, অবস্থাবিশেষে এবং ক্ষেত্রবিশেষে, এ সকলেরি দরকার আছে। যেমন হেতু (যথা, ধুম) দেখে আমরা সেই হেতুর সঙ্গে নিয়ত থাকে এমন একটা কিছুর (যেমন, বহ্নির) অনুমান করিয়া থাকি। কিন্তু হেতুটা "সৎ", কিনা, যে অনুমান করিব তার পক্ষে উপযুক্ত, সমর্থ হওয়া চাই। কিন্তু অনেক সময় এ রকম সত্যিকার হেতু হয়ত' নেই, বাজে হেতু (যার ব্যভিচার আছে, যেটা বিরুদ্ধ ইত্যাদি) লইয়া অনুমান করিতেছি, সেখানে হেত্বাভাস হয় ("হেতুলক্ষণাভাবাদহেতবো হেতুসামান্যাদ্ হেতুবদাভাসমানাঃ"—ন্যায়ভাষ্য) ; আর সে রকমের অনুমান "অসদ্ধেতুক" হইয়া থাকে।

যদি বলা যায়, ঐ পাহাড়ে আগুন আছে, কেননা, ওখানে মানুষ আছে দেখছি ; তা হ'লে অনুমান কি ঠিক হ'ল ? মানুষ থাকিলে যে আগুন থাকিবেই, এমন কথা নেই। মানুষটা হয়ত পাহাড়ে কাঠ কাটিতে অথবা গরু ছাগল চরাইতে গিয়াছে। হয়ত' ছেলে-মানুষ কি মেয়েমানুষ—তামাক খাবার আগুনও নিয়ে যায় নি। আর যদি ঘরদোর বেঁধেই ও-পাহাড়ে মানুষ থাকে, তা হ'লে আগুন থাকা খুব সম্ভব বটে ; কিন্তু লোকের ঘরে সব সময় আগুন না থাকতেও পারে। মানুষটা দেখে যে কালে আমি আগুনের অনুমান করছি, সে সময় হয়ত' আগুন নাই। এক কথায়, হেতু (বা লিঙ্গ) আর সাধ্য (হেতু দেখে যেটার অনুমান করিতেছি), এ দুয়ের ভেতর একটা নিয়ত সহচার সম্বন্ধ কোনভাবে থাকা চাই; এবং সেটা আমার জানা দরকার। ঐ রকমের নিয়ত সহচার (invariable connexion) কে ব্যাপ্তি বলে। এ গেল মোটামুটি কথা। পরে আরও বল্‌ব। তবেই পাচ্ছি যে, হেতু যা-তা একটা দিলেই অনুমান করা যায় না। হেতুটি নির্দোষ, সমর্থ হওয়া চাই। অসৎ বা দুষ্ট হেতু অনেক রকমের (ন্যায়ে পাঁচ রকমের, বৈশেষিকে তিন রকমের, তাদের আবার অনেক অবান্তর ভেদ আছে)। তার ভেতর একরকম হইতেছে অসিদ্ধ। এই অসিদ্ধের ভেতর এক থাকে পড়ে "উপাধি"

("সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপক উপাধিঃ")। উপাধি থাকাও একটা দোষ। হেতুতে এ দোষ থাকিলে চলিবে না। হেতু "নিরুপাধি" হওয়া চাই।

ধোঁয়া দেখে পাহাড়ে বা অন্য কোথাও আগুন আছে অনুমান কর্‌লে ভুল হয় না। কিন্তু আগুন দেখেই বলা যায় না যে, ধোঁয়া আছেই। কেন না, ভিজে কাঠ, সাধারণ বারুদ—এই রকমের অনেক জিনিষ জ্বল্‌লে যে আগুন হয়, তাতেই ধোঁয়া থাকে ; কিন্তু ইলেক্‌ট্রিক আগুন, অনেক রকম গ্যাসের আগুন, আগুনে পোড়ানো টক্‌টকে লাল লোহার গোলা—এ সবই আগুন বটে, কিন্তু ধোঁয়া নেই। কাজেই আগুনকে ধোঁয়ার অনুমানে হেতু করতে গেলে, শুধু আগুন বল্‌লে চলে না, "ভিজে কাঠের আগুন," "তুবড়ির আগুন," "প্রদীপের শিসের আগুন"—এই রকমধারা সম্পর্কের কথা তুলে বল্‌তে হয়। যেখানে যেখানে ভিজে কাঠের আগুন আছে, সেখানেই ধোঁয়া আছে—এ বল্‌লে দোষ হয় না ; কিন্তু সোজাসুজি, কোন্ রকমের আগুন তা না ব'লে, যেখানে আগুন সেখানেই ধোঁয়া, এ বল্‌লে দোষ হয়। উপাধিও ক'রকমের আছে। যাই হোক্—অনুমানের হেতু ভাবতে গেলেই দেখতে হয় উপাধি আছে কি না। ইংরাজি ন্যায়শাস্ত্রে এ সব Fallacyর মধ্যে পড়ে। Fallacy Material এবং Formal দু'রকমের আছে। আমরা যে দোষের কথা ওপরে বল্‌লাম, সেটা Material Fallacyর ভেতরেই পড়ে। আমাদের ন্যায়শাস্ত্র প্রধানতঃ Deductive Logic নয় ; আর আমাদের যেটা "ন্যায়" (যার পাঁচটা অবয়ব—প্রতিজ্ঞা, হেতু, দৃষ্টান্ত উপনয়, নিগমন ; বৈশেষিকেও পাঁচটা, কিন্তু নাম কয়টা সব মেলে না), সেটাকে Deductive Logic এর Syllogism মনে করা যায় না। সেটা Induction আর Deduction এর সমাহার।

মোটামুটি এভাবে আমরা দেখিলাম যে ন্যায়দর্শনের ষোলটি পদার্থের ভেতর "প্রমেয়"টাকে বাদ দিলেও, বাকিগুলোকে

"প্রমাণ" বলা যায় না বটে, কিন্তু সাক্ষাদ্‌ভাবে না হইলেও, প্রমাণ কি বা কিসে, এটা জানিতে গেলে, যাতে যাতে প্রমাণের উপকার হয় অথবা বাধা হয়, সেগুলিও আমাদের জানিতে হয়। এইজন্য প্রধানতঃ প্রমাণ-পরীক্ষার জন্য যে ন্যায়শাস্ত্র, তাতে এ সব আছে। ইতিহাসের পক্ষ হইতে অনেকে একথাও বলেন যে, ন্যায়দর্শন গোড়াতে প্রমাণ, তার উপায় ও প্রণালীর দোষগুণ বিচার লইয়াই ছিল; প্রমেয়ের কথা তাতে ছিল না (ঈশ্বর, জীবাত্মা, পরলোক, ধর্ম্মাধর্ম্ম, মোক্ষ ইত্যাদির আলোচনা)। পরে, বেশীর ভাগ বৌদ্ধ দর্শনগুলোর পাল্টা জবাব হিসাবেই এতে ওসব ঢোকানো হইয়াছে। বৌদ্ধ দর্শনগুলো প্রত্যক্ষ আর অনুমান ছাড়া সত্য জানিবার অন্য কোনও উপায় মানিতেন না। ন্যায়দর্শন এ দুটি ছাড়া আরও দুটি (আগম ও উপমান) প্রমাণ মানার হেতু দেখাইয়াছেন। বৌদ্ধদের 'লঙ্কাবতার সূত্রে'ই বোধহয় ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ প্রথম বলা হয়; আর নাগার্জুনই বোধহয় শূন্যবাদ আর মাধ্যমিক মত ভাল করিয়া প্রথমে বলেন। ন্যায়দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের কয়টা সূত্রে এ সবের বিচার আছে। কাজেই, ইতিহাসের তরফ থেকে কেউ কেউ ভাবেন —আগে ন্যায় ন্যায়ই ছিল—Logic ছিল। তার পর বৌদ্ধ জৈন-দের বেদ না মানার যুক্তির পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে তাতে বেদ-প্রামাণ্যের কথা; নৈরাত্ম্যবাদের জবাব দিতে গিয়ে ঈশ্বর ও জীবাত্মার কথা; শূন্য ও ক্ষণিকবাদের উত্তরে পরমাণু, আকাশ, কাল প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যের, সমবায়াদি নিত্য সম্বন্ধের কথা তাঁদের তুল্‌তে হয়েছিল; পরে আবার আস্তিক দর্শনগুলোর সমবেত চেষ্টায় যখন ঐ সব নাস্তিক পক্ষ দুর্বল হ'য়ে পড়েছিল, তখন, ন্যায়দর্শন আস্তে আস্তে আত্মাদি প্রমেয়ের বিচার প্রায় ছেড়ে দিয়ে, গোড়ায় যা ছিল ফিরে তাই (অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র) হ'তে চেয়েছিল। নব্যন্যায়ে (গঙ্গেশের 'চিন্তামণি'তে অনুমানখণ্ডে ঈশ্বরানুমান একটা প্রকরণ বটে) তর্কের দিক্‌টাই প্রায় ষোল আনা হ'য়ে পড়েছে।

একেবারে গোড়ায় যাই হোক্, এখন আমরা ন্যায়সূত্র আর ভাষ্যবার্তিকটীকা প্রভৃতি যে আকারে পাচ্ছি, তাতে, প্রমেয়ের বিচার যথেষ্টই আছে, দেখতে পাই। ন্যায়দর্শন (১।১।৯ সূত্রে) আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, তাদের অর্থ বা বিষয়, মন, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব (পরলোক, জন্মান্তর), ফল, দুঃখ, অপবর্গ—এ গুলিকে প্রমেয় বলিয়াছেন। আমাদের সব চাইতে বেশী ক'রে এ সবই জান্‌তে আগ্রহ হয় না কি? এ সব জানার চাইতে বেশী আগ্রহ বা interest কিসে? আমি কে, আমার দুঃখ-বন্ধনাদি কি, আর কিসে? এ সব জেনে দুঃখ একেবারে এড়াতেও পারি। আর তা যদি নাও পারি, তা হইলেও, মানুষের সব চাইতে গভীর ও উদ্‌গ্রীব কৌতুহলটার নিবারণের একটা চেষ্টা ঐ জানার ভেতর দিয়াই হইতে পারে। ঠিকভাবে কি জানিতে পারা যায়—ন্যায়-বৈশেষিক তা কি পারিয়াছেন? সেটা অবশ্য আলাদা কথা। বিবাদীরা ন্যায়-বৈশেষিকের মতন করিয়াই জানেন নাই। বৌদ্ধাচার্যেরা (যেমন যোগাচার বা ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদের তরফ থেকে শান্তরক্ষিত এবং তাঁর শিষ্য কমলশীল তাঁদের 'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থে আর তার টীকায়) অনেকে গোড়া ধরিয়াই টান দিয়াছেন। অনেকে গোড়ায় হাত না দিলেও, ওপর ওপর কিছু কিছু সংস্কার করিতে যত্ন করিয়াছেন। কাজেই, বিবাদ যে নেই, এমন নয়। কিন্তু বিবাদের আগে, যা নিয়ে, অর্থাৎ যে প্রমাণ নিয়ে, বিবাদ করিব, তার একটা হেস্তনেস্ত হইলেও ভাল হয়। সে পক্ষেও হেস্তনেস্ত হওয়া সহজ নয়—কি প্রমাণ, কটা বা ক'রকম প্রমাণ—এ নিয়ে পরীক্ষকেরা সকলে একমত হইতে পারেন নাই। কস্মিন্ কালে পারিবেন বলিয়াও মনে হয় না। তবু সাধারণের জন্যে প্রমাণ নিয়ে পরীক্ষা করা ছাড়া অন্য রাস্তা নেই।

সংশয়, মনন, বিচার—এ সমস্ত আমাদের মনের স্বাভাবিক বৃত্তি। আত্মা, পরলোক ইত্যাদি বিষয়ে, হয় নাস্তিক, না হয় আস্তিক, এ দুয়ের কোন একটা রাস্তায় আমরা পা না বাড়াইয়া

থাকিতে পারি কৈ? দর্শনে কোন মীমাংসা মিলিবে না ভাবিলেও, এ সব বিষয়ে এক না এক রকম ভাবনা চিন্তা না করিয়া পারি কৈ? তত্ত্ব মনন বা চিন্তার বাইরে—এ পক্ষেও নিশ্চিন্ত হইতে হইলে, মনন বা চিন্তা করিয়াই আমার মনের মামুলি জেরাগুলি থামাইতে হয়। এইজন্য মনন একভাবে না একভাবে চাই-ই। আগে যে সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন অধিকারীর কথা বলিয়াছি, তাঁদের এটা বেশী দরকার হয় না; অল্পেই কাজ হয়। কিন্তু আমাদের মতন "বাজে" লোকদের জন্য খানিকটা বাইরের খাটুনি (জমিটাকে কাঁটা দিয়ে ঘেরা, চ'ষে ফেলা, আগাছা নিড়িয়ে ফেলার) দরকার আছেই। এই খাটুনিটা বেশ হিসাবমত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে, চালাবার জন্যই ন্যায়শাস্ত্র।

বৈশেষিক পদার্থগুলোকে রকমারি করিয়া সাজাইয়াছেন—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়—এই ছয়টা। এর সঙ্গে অভাব ব'লে আর একটা পদার্থ জোড়া দিতে হ'বে কি না হবে, তা নিয়ে মতভেদ আছে। ব্যোমশিব ব'লে একজন প্রাচীন পণ্ডিত গঙ্গেশেরও আগে "সপ্তপদার্থী" নামে এক পুঁথি লেখেন। নব্যন্যায়ে সাতটাই চল্‌ছে। খুব নব্য জগদীশ তর্কালঙ্কার 'তর্কামৃতে' পদার্থ ভাব আর অভাব, এই দুই রকম বলেই আরম্ভ করেছেন। নব্য-ন্যায়ের আকরগ্রন্থ 'চিন্তামণি'র প্রত্যক্ষ খণ্ডে ৭ম প্রকরণ (অভাববাদ) ইত্যাদিরও উল্লেখ করা যেতে পারে। ছ'টাই হোক, আর সাতটাই হোক্‌, পদার্থ, ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন "অস্ত্যন্যদপি দ্রব্যগুণকর্ম-সামান্যবিশেষসমবায়াঃ প্রমেয়ম্‌। তদ্‌ভেদেন চাপরিসংখ্যেয়ম্‌।" —এই ব'লে প্রমেয়ের মধ্যেই ফেলেছেন। ফল কথা, ন্যায় প্রমেয় (যা প্রমাণ দিয়ে জান্‌তে হবে) গুলোকে একভাবে সাজাইয়াছেন, বৈশেষিক আর এক ভাবে। ন্যায়ের সাজানোটা সোজা হিসেবের দিক্‌ দিয়ে; বৈশেষিকের সাজানোটা সূক্ষ্ম হিসেবে। ইংরাজিতে বল্‌তে গেলে এগুলোকে মূল Concepts or Categories বল্‌তে হয়। ওদেশে এরিষ্টটল্‌ থেকে আরম্ভ ক'রে মধ্যযুগের "স্কুলমেন,"

তারপর কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি, আর আজকাল বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি পদার্থ কয় রকম, তা ঠিক কর্‌তে চেষ্টা ক'রেছেন। পদার্থ মানে যেন বস্তু (thing) না বুঝি—বোধোদয়ের সেই চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্। আমাদের ভাবনা চিন্তা, বলা কওয়া—এ সমস্ত কি কি মূল ও স্বতন্ত্র ধারণা (Ideas) অবলম্বনে হ'য়ে থাকে—এইটেই হ'ল প্রশ্ন। কাণ্টের দেশ ও কাল এই দুটো Form, আর Quantity, Quality, Relation, Modality, এই চার রকমের বারটা Category একদিন পশ্চিমের দার্শনিক চিন্তায় অনেকখানি ঠাঁই জুড়ে ছিল। পরে অনেকে কাটা ছাঁটা করতে চেয়েছেন। মনে রাখতে হবে, বৈশেষিকের পদার্থ Categories। তাই ব'লে বৈশেষিক একথা বলেন নি যে, ওগুলো আমাদের ভাবনা চিন্তার গণ্ডীর বাইরে সত্য সত্যই "স্বাধিকারে" বিদ্যমান কোন তত্ত্ব নয় ;—কাণ্ট যেমনধারা বলতে চেয়েছিলেন।

আমরা বলিয়াছি যে, ন্যায়ে প্রমাণের কথাটাই বেশী আছে ; বৈশেষিক দর্শনে বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, ঈশ্বর, এ সবের অনুমান প্রসঙ্গে (দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম ও দ্বিতীয় আহ্নিকে), এবং আত্মার অনুমান প্রসঙ্গে (তৃতীয়াধ্যায়ের দুটি আহ্নিকে) প্রমাণের অনেক কথা আছে ; প্রমেয়ের বিচারের জন্য আবশ্যক হইয়াছে বলিয়াই আছে। এ কথাও ঠিক যে, বৈশেষিকে ন্যায়ের মতন চারিটি প্রমাণ না মানিয়া, প্রত্যক্ষ আর অনুমান, এ দুয়ের ভেতরেই সব ঢোকাবার চেষ্টা হইয়াছে। নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিক (বিশেষ, "এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতম্" সূত্রটি) এ প্রসঙ্গে আলোচ্য। বৈশেষিক অথচ আম্নায় বা বেদের প্রামাণ্য মানেন। গোড়ার দিকে এক সূত্রে আর একবারে শেষের সূত্রে "তদ্‌বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" বলিয়া বেদ মানা হইয়াছে। অন্যত্রও বেদের দোহাই আছে। তবে বলার ভঙ্গীতেই বোঝা যায়, সে প্রামাণ্য অনুমানাদির বলেই সাব্যস্ত হয়। নব্যেরা কিন্তু প্রায়ই চারটি প্রমাণই মানিয়াছেন।

এবার সোজা ক'রে প্রমাণের কথা বোঝ্‌বার চেষ্টা করব। "প্রমা" মানে যে যথার্থ বা ঠিক ঠিক জ্ঞান, তা আমরা আগেই ব'লেছি। এখন, এই ঠিক ঠিক জ্ঞানের যেটি "করণ", সেইটে প্রমাণ; অর্থাৎ যাতে ক'রে ঠিক ঠিক জ্ঞান হয়। যেটা ঠিক ঠিক জ্ঞান নয়, সেটা অপ্রমা। সংশয় ও বিপর্যয় (অন্যথাখ্যাতি বা যেটা যা সে প্রকারে নয়, অন্যপ্রকারে জ্ঞান, যেমন, দড়িতে সাপ), এ দুইই অপ্রমার কোঠায় পড়ে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান আর শাব্দ-- এই চার রকমের যদি প্রমা হয়, তবে ঐ চার রকমের অপ্রমা বা বেঠিক জ্ঞানও আছে। ঠিক ঠিক প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদি না হ'লেই অপ্রমা হবে।

মনকে বাদ দিলে আমাদের পাঁচটা (চোখ কাণ, নাক ইত্যাদি) বাইরের বস্তু বা ব্যাপার জান্‌বার ইন্দ্রিয় র'য়েছে। এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাদের অর্থ বা বিষয়ের সম্পর্ক (সন্নিকর্ষ) হ'লে আমাদের বাইরের বিষয়ের জ্ঞান হয়। যেমন, এক গ্লাস জল কেউ এনে দিলে। আমি তাকিয়ে দেখ্‌লাম, বেশ পরিষ্কার জল; খেয়ে দেখলাম, বেশ ঠাণ্ডা। বিলেতী শাস্ত্র বলেন— খাঁটি জলে কোনও আস্বাদ নেই; দেশী কেউ কেউ বলবেন— মধুর স্বাদ আছে, লুকিয়ে আছে। যাই হোক্, এই জ্ঞানটাকে ঠিক বলব, না বে-ঠিক বলব? ঠাণ্ডা (স্পর্শের) কথা বাদ দিয়ে, "পরিষ্কার" এই রূপটার কথা ধরা যাক্। ন্যায়সূত্রের গোড়াতেই (৪র্থ সূত্রে) প্রত্যক্ষ প্রমার লক্ষণ আছে— "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যম ব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্।" কেবল, ইন্দ্রিয় আর বিষয়ের সন্নিকর্ষ হ'লেই যে হোল' না, ইন্দ্রিয় আর মন, মন আর আত্মারও যে সংযোগ অপেক্ষা আছে, তা ভাষ্যকার গোড়াতেই ব'লে গিয়েছেন; তবে, সেগুলো সাধারণ কারণ (সব ক্ষেত্রেই দরকার) এর কোঠায় পড়ে ব'লে, তাদের আর প্রত্যক্ষ সূত্রে আলাদা ক'রে বলা হয় নি। ঘড়ি বাজ্‌ল, কিন্তু আমার মন যদি অন্য দিকে থাকে ত' ঘড়ির আওয়াজ

শুন্‌তে পাইনে। মনঃসংযোগ দরকার। তারপর, জ্ঞানটা আত্মা বা আমারই একটা বৃত্তি বা গুণ ; সে গুণটা (যেমন, পরিষ্কার এই এক গ্লাস জল দেখা) কখনও আমাতে থাকে, কখনও বা না থাকে। মনের কাছে ইন্দ্রিয় তার বিষয় এনে দেয়, মন আবার আত্মাতে সেই বিষয়ের অনুরূপ একটা জ্ঞান জন্মে দেয়। "এক গ্লাস পরিষ্কার জল" —এই ভাবে আমার অনুভব হয়। এ রকমের অনুভবকে (ন্যায়ে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, শব্দ এ চারটে নিয়ে যথার্থ, অযথার্থ যে জ্ঞান, তাকে অনুভূতি, আর স্মৃতি শুদ্ধ জড়িয়ে বুদ্ধি বলে) "ব্যবসায়" (Presentation) বলে। আবার, ব্যবসায়কে বিষয় ক'রে যে জ্ঞান (যেমন, "আমি পরিষ্কার জলের গ্লাসটা জান্‌ছি"), তাকে অনুব্যবসায় বলে।

ইন্দ্রিয় আর বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইলে যে জ্ঞান হয়, তা প্রত্যক্ষ বটে ; কিন্তু "অব্যপদেশ্য" "অব্যভিচারী" "ব্যবসায়াত্মক" না হইলে প্রমা বা যথার্থ হয় না। "অব্যপদেশ্য" কথাটার যে কি মানে তা লইয়া ভাষ্যকার, বার্তিককার, তাৎপর্যকার, বৃত্তিকার (বিশ্বনাথ) প্রভৃতি আলোচনা করিয়াছেন। মোটামুটি কথাটা এই :— কোন একটা অর্থ বা বিষয় জানা এক ব্যাপার, আর তা নিয়ে বলা-কওয়া, ভাবনা-চিন্তা ইত্যাদি ব্যবহার আর এক ব্যাপার। শেষের কাজটা করিতে গেলে নাম, সংজ্ঞা বা সমাখ্যা আবশ্যক। এক গ্লাস জল দেখিতে বা পান করিতে, "গ্লাস, জল" এ দুটো নাম না জানিলেও চলে ; অনেক সময়, নামের কথা না ভাবিয়াই আমরা জলের গ্লাস দেখি বা পান করি ; খুব ছোট ছেলে হয়ত' মোটেই নাম জানে না; ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় নামও আলাদা। কাজেই, জলের গ্লাস দেখিতে বা পান করিতে নাম বা সংজ্ঞার দরকার হয় না। কিন্তু বলা-কওয়া করিতে গেলে, এমন কি, তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করিতে গেলেও, নাম চাই। "তদেবমর্থজ্ঞানকালে স ন সমাখ্যাশব্দো ব্যাপ্রিয়তে, ব্যবহারকালে তু ব্যাপ্রিয়তে"—ভাষ্য। শব্দ বা সংজ্ঞার অপেক্ষা

না রাখিয়াই ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্থের বা বিষয়ের যে জ্ঞান হয়, তাই প্রত্যক্ষ। শব্দ বা নাম আশ্রয় করিয়া যে জানা, তাকে আলাদা করিবার জন্য, অব্যপদেশ্য লক্ষণটি দেওয়া হইয়াছে। "তেন ব্যপদিশ্যতে জ্ঞানং, রূপমিতি জানীতে রস ইতি জানীতে নামধেয়শব্দেন ব্যপদিশ্যমানং স চ শাব্দং প্রসজ্যতে অত আহ— অব্যপদেশ্যমিতি।"—ভাষ্য। মোটামুটি কথাটা বুঝিলাম। তারপর, অব্যভিচারি। 'যদতস্মিংস্তদিতি তদ্ ব্যভিচারি, যত্তু তস্মিংস্তদিতি তদব্যভিচারি, প্রত্যক্ষমিতি'। গরমের দিনে সূর্যের উত্তাপে মাটির রস বাষ্পের আকারে ওঠে, কাঁপ্‌তেও থাকে—দূর থেকে দেখে সেটাকে জল ব'লে মনে হয়। এটা প্রত্যক্ষ হ'লেও ভুল। আগে আমরা এটাকে বিপর্যয় ব'লেছি। তারপর, দূর থেকে "এটা ধোঁয়া না ধূলো" এই রকমধারা যে অনবধারণ (অনিশ্চিত) জ্ঞান হয়, তাকেও প্রত্যক্ষ বলা হবে না। অবধারণ বা নিশ্চয়রূপে জ্ঞান হওয়া চাই (ব্যবসায়াত্মক বলাতে এইটে পাওয়া গেল)। মোটামুটি দেখতে গেলে, কথাগুলোয় গোল নেই।

অবশ্য প্রত্যক্ষকে নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক—এই দুইরকম করিয়া নেওয়া যায়। কোন বস্তুর পানে চাওয়া মাত্রই যে তার বৈশিষ্ট্য আর প্রকারতা ফুটে ওঠে ("ভাসমান" হয়), এমন নয়। কোন একটা গাছের পানে চাইলেই প্রথমে একটা (অনির্দিষ্ট) বস্তু অথবা একটা গাছ এই রকমের খুব মোটামুটি রকমের একটা জ্ঞান হয়। কোন্ প্রকারের গাছ, আর আর জিনিস থেকে কোথায় তার বিশেষ—এগুলো প্রথমেই অনুভবে ফুটে বা ভেসে ওঠে না। দূর থেকে পরেশনাথ পর্বতের পানে চাইলে প্রথমে "একটা কিছু" এই রকমের বৈশিষ্ট্যহীন, নিষ্প্রকারক অনুভব হয় ; তারপর "ওটা পাহাড়" এইরকমের 'বিশেষ' (ওটা) ও 'প্রকার' (পাহাড়) নিয়ে অনুভব হয়। তারপর, "ওটা খুব বড় পাহাড়, তিনটে বড় চূড়ো দেখা যাচ্ছে ; তার মধ্যে ঐটে সব চাইতে উঁচু"—এই রকমের

প্রকারতা আরও বেশী ভেসে ওঠে। গ্রাণ্ডকর্ড লাইন দিয়ে ট্রেণে যেতে সব চাইতে বড় চূড়োটার ওপর মন্দিরও দেখ্‌তে পাওয়া যায়; তু'একখানা বাড়ীও দেখা যায়। আমরা প্রথম অধ্যায়ে জাহাজের সার্চলাইটের দৃষ্টান্ত দিয়ে যে ব্যাপারটা বুঝতে চেয়েছিলাম, সেই ব্যাপারটা চল্‌তে থাকে। বৈশিষ্ট্য আর প্রকারতা ক্রমেই বেশী ফুটে উঠ্‌তে থাকে। বৈশিষ্ট্য যে অনুভবে "ভাসমান", সে প্রত্যক্ষানুভব সবিকল্প; আর যাতে ভাসমান নয়, সেটা নির্বিকল্পক। ন্যায়ের চলিত দৃষ্টান্তে "ঘট ঘটত্ব" এই রকম নির্বিশেষ জ্ঞানটা নির্বিকল্পক, আর "অয়ং ঘটঃ", "অয়ং রক্তো ঘট" ইত্যাদি জ্ঞানটা সবিকল্পক। পরের দৃষ্টান্তে, কেবল ঘটমাত্র বা ঘটত্বরূপ জাতিটা (type) নয়, একটা সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ভাবে ঘটকে আমরা জান্‌ছি। "এই ঘট" বল্‌লে যেটা-সেটা, যেমন-তেমন একটা ঘট (যাতে ঘটত্ব এই সাধারণ ধর্মটা আছে) আর থাক্‌ল না; আর পাঁচটা থেকে তাকে বিশেষ ক'রে বেছে নেওয়া হ'ল, একটা নির্দিষ্ট রকম (প্রকার) ক'রে দেখা হ'ল। এখন তার সঙ্গে আর পাঁচটা ঘটের, এমন কি আর আর জিনিষেরও, সম্বন্ধটা ভেসে উঠেছে। যার সম্বন্ধ তাকে (আধেয়টাকে) যদি সম্বন্ধের "প্রতিযোগী" বলি, তাহলে ওপরে যা বল্‌লাম তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, নির্বিকল্পক জ্ঞানে সম্বন্ধের প্রতিযোগিতাটা ভাসমান থাকে না, সবিকল্পকে তা থাকে। যে ক্ষেত্রে বস্তুর স্বরূপটাই জান্‌লাম, কিন্তু তার সম্বন্ধের জ্ঞানগুলো ভেসে উঠ্‌ল না—সে ক্ষেত্রে নির্বিকল্পক হ'ল। সম্বন্ধ বাদ দিয়ে জ্ঞান হ'লে, সেটা জ্ঞানও বটে, সত্যও হ'তে পারে বটে, কিন্তু তা নিয়ে পূরাপূরি ব্যবহার চলে না। গঙ্গেশ উপাধ্যায় 'চিন্তামণি'র প্রত্যক্ষখণ্ডের শেষের তুটো প্রকরণে এদের কথা ব'লেছেন। টীকাকার আর তস্য তস্য টীকাকারেরা তা নিয়ে চুলচেরা বিচার কর্‌তে ছাড়েন নি। সাংখ্যাচার্যেরাও নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের মতন একটা কিছু মেনেছেন। "আলোচনবৃত্তির" কথা কারিকায় ও কৌমুদীতে আছে। মীমাংসক কুমারিলভট্টও সদ্যোজাত

শিশু চোখ মেলে যেমনধারা জানে তেমনিধারা জানাকে "আলোচন" বলেছিলেন।—অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্বিকল্পকম্। বাল-মূকাদিবিজ্ঞানসদৃশং শুদ্ধবস্তুজম্ ॥১১২॥—শ্লোকবার্তিক (১।১৪)। বিশেষ অথবা সামান্য এ দুইয়ের কোনটাই তাতে ভাসমান হয় না (তাঁর মতে), কিন্তু তাদের আধার যে ব্যক্তি, কেবল সেইটেই ফুটে থাকে (১।১৩)। এঁদের আগে বৌদ্ধ দার্শনিকেরা (দিঙ্‌নাগ, ধর্মকীর্তি) কল্পনাপোঢ় এবং সবিকল্প জ্ঞানের আলোচনা করে গিয়েছিলেন। আধুনিক কাণ্ট প্রভৃতির মত তাঁরাও বলেছিলেন যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কতকটা ইন্দ্রিয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের এনে দেয়, আর কতকটা আমাদের কল্পনা তার সঙ্গে যুড়ে দেয়—Matter and Form of Knowledge.

তারপর, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থের সন্নিকর্ষ। এই সন্নিকর্ষ ব্যাপারটাই প্রত্যক্ষজ্ঞানে আসল। এটাকে নিয়ে পশ্চিমের দেহ-তত্ত্ববিৎ (physiologist) আর মনস্তত্ত্ববিদেরা (psychologistরা) বিস্তর অনুসন্ধান ক'রেছেন। তাঁদের সে অনুসন্ধান প্রধানতঃ বিজ্ঞানের দিক দিয়ে—ঈথার বা বায়ু, তার তরঙ্গ, তরঙ্গের বেগ ও আকৃতি, চক্ষুঃ ও কর্ণের যন্ত্রের গঠন; বাইরের ধাক্কা (stimulus)-গুলো কি ভাবে এদের উত্তেজিত (excite) করে; ফলে কি ব্যাপার হয়; স্নায়ুযন্ত্রের কাজ; মগজের কেন্দ্রগুলোর কাজ;—এ সবের বর্ণনা আর হিসেব-নিকেশ পশ্চিমের পণ্ডিতেরাই ভাল ক'রে ক'রেছেন। আমাদের দর্শনগুলো সন্নিকর্ষ ব্যাপারটাকে অন্য দিক্ দিয়ে বোঝাতে যত্ন ক'রেছে। শব্দের বেলায় বীচিতরঙ্গ আর কদম্বগোলক রীতিতে বায়ুস্পন্দনের বিস্তার এবং কাণের পটহে অভিঘাত নৈয়ায়িক প্রভৃতি যে না ভেবেছেন, এমন না। কিন্তু, বাইরের অর্থ বা বিষয় ইন্দ্রিয়ের ওপর ঠিক কি ভাবে কাজ করে, আর আমাদের দেহে তার ফলে শেষ পর্যন্ত যে কি হয়—এ ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক বিবৃতি

৬

পশ্চিমের গুরুমশায়দের মুখেই আজকাল আমরা বেশী শুন্‌তে পাচ্ছি।

কিন্তু তথ্যের দিক্ দিয়ে (as regards facts relating to sense-perception) এঁরা বেশী এগিয়ে গেলেও, তত্ত্বের (as regards the principles involved) দিক্ দিয়ে এঁরা যে আমাদের পূর্বাচার্যদের ছাড়িয়া গেছেন, এমন মনে হয় না। এক-দিকে—তথ্যের দিকেও—তাঁদের একটা বড় গোছের কথা আছে। সন্নিকর্ষটাকে তাঁরা লৌকিক বা সাধারণ ক'রেই দেখেন নি; অলৌকিক অসাধারণ সন্নিকর্ষও মেনেছেন। এই অলৌকিকটা তিন রকমের পরে মনে করা হ'য়েছে। তার ভেতর যোগজ সন্নিকর্ষই আসল। যোগ মানে "সংযম" (ধারণা-ধ্যান-সমাধি) হ'তে পারে; আবার, গীতার ভাষায় "কর্মসু কৌশলম্"কেই যোগ বলা যেতে পারে। তা হ'লে, আজকালকার বৈজ্ঞানিকদের যন্ত্রাদি সাহায্যে জ্ঞানগুলোকেও যোগজ সন্নিকর্ষের ভেতর ফেলা যেতে পারে। চোখে গ্লাসের জল পরিষ্কার দেখ্‌ছি; অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যদি তাতে অনেক কিছু দেখি, তবে এই যন্ত্রপাতি নিয়ে দেখাটা যোগজ প্রত্যক্ষ। লৌকিক প্রত্যক্ষ সাধারণ কারবারি (ব্যাবহারিক) হিসাবে সত্য। যোগজ প্রত্যক্ষ দিয়ে তার বাধ, শোধন, সংস্কার হ'তে পারে। আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা হামেশাই তা কর্‌ছেন।

কিন্তু যোগের আসল মানেটা (সংযম) নিলে, বিজ্ঞান কি বল্‌বেন? এতদিন সরাসরি ও-সব "বুজরুকি" অথবা মনের ভ্রম, "খেয়াল"—এই রকম একটা কিছু বল্‌তেন, সম্প্রতি ওদেশে parapsychic এবং spiritualistic phenomenaর আলোচনার ফলে সতর্ক হ'য়ে কথা ক'চ্চেন।

এদেশে যোগজ অনুভূতির পরিচয় ঐতিহ্যে, এবং একটু আধটু ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাতেও, চিরদিন এত স্পষ্ট আর সজাগ যে, অন্ততঃ ঘটনা হিসাবে, দেহাত্মবাদী নাস্তিকেরা পর্যন্তও, তাদের

কিছু কিছু না মানিয়া পারেন নাই। যাই হোক্, যোগজ সন্নিকর্ষ সুতরাং অলৌকিক প্রত্যক্ষ, মানিয়া আমাদের দর্শন শাস্ত্রগুলি সাধারণ, লৌকিক প্রত্যক্ষের ন্যূনতা দেখাইয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখাইয়াছেন যে, উপায়-বিশেষের দ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভূতির গণ্ডী কত বড় হইতে পারে, তার বিষয় (content) কত অসাধারণ গোছের হইতে পারে। লৌকিক প্রত্যক্ষ যেটা জানিতে পারিল না, সেটা যে আদপে প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারে না; অথবা সাধারণ প্রত্যক্ষে যেটাকে যে রকমে জানিতেছি, অসাধারণ প্রত্যক্ষে সেটাকে যে অন্য রকমে জানিতে পারি না;—এমনধারা গোঁড়ামি করিতে দর্শনশাস্ত্রগুলি আমাদের বারণ করেন। সাংখ্যদর্শন (৭ম কারিকায়) যা বলিয়াছেন, তাতে সকলেরই সম্মতি—"অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্ মনোঽনবস্থানাৎ। সৌক্ষ্ম্যাদ্ ব্যবধানা-দভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ।" তাই বাচস্পতি মিশ্র টীকায় (তত্ত্ব কৌমুদীতে) সত্যই বলিয়াছেন—প্রত্যক্ষ হচ্ছে না ব'লে বস্তু নেই বল্‌লে হয় না; "যোগ্যপ্রত্যক্ষ-নিবৃত্তেরয়মভাবং বিনিশ্চিনোতি।" যোগ্যপ্রত্যক্ষ-নিবৃত্তি, যোগ্যানুপলব্ধি নিয়ে চিন্তামণিকার এবং পরবর্ত্তী নব্যেরা অনেকে চুলচেরা বিচার ক'রেছেন। সূক্ষ্ম কথা ছেড়ে দিলে বল্‌তে হয়—প্রত্যক্ষ করার সাধারণ, অসাধারণ যত রকম কারণ হ'তে পারে, সে সকল যথাযথ থাকা সত্ত্বেও যদি প্রত্যক্ষ না হয়, তবে বুঝ্‌তে হবে, সত্যই বস্তুটি নেই। শুধু চোখে জলে পোকা না দেখ্‌তে পেলেই বৈজ্ঞানিক সন্তুষ্ট হবেন না; অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখ্‌বেন। সাধারণ অণুবীক্ষণেও দেখা যায় না এমন সব উদ্ভিদ্-জীবনের ব্যাপার এখন আমরা ক্রেস্‌কোগ্রাফ ইত্যাদি যন্ত্রের কল্যাণে দেখ্‌তে পাচ্ছি। এতেও ইতিশেষ দেওয়া যায়না। যোগের দ্বারা আরও সূক্ষ্মের ভিতর হয়ত' গতি হ'তে পারে। অন্ততঃ এদেশে প্রাচীনেরা তা বিশ্বাস কর্‌তেন। কেন তা হবে—তার কৈফিয়ৎও সাংখ্যপাতঞ্জলাদি শাস্ত্রে তাঁরা দেবার চেষ্টা ক'রেছেন।

ফল কথা, একটা যাথার্থ্যের ক্রমোন্নত শ্রেণী (সিরিজ) আমরা পাই। আমাদের সাধারণ প্রত্যক্ষ (average, normal perception) আর তার আশ্রয়ে অনুমানাদি হ'ল— প্রথম ধাপ। এ ধাপ ছাড়িয়ে অসাধারণ প্রত্যক্ষের ধাপ— অনেকগুলি ধাপ পর পর ক্রমে পূর্ণ সত্যের ভূমির দিকে চলিয়াছে। বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি নিয়া, গণাগাথা করিয়া কতকগুলো ধাপ ভাঙ্গিয়া উঠিয়াছেন, এখনও উঠিতেছেন। এ ওঠার শেষ নেই। যোগীরাও আর এক রাস্তা ("সংযম") ধরিয়া উঠিতেছেন বা উঠিয়াছেন। এ ওঠারও শেষ নেই। বৈজ্ঞানিক ও যোগীদের জ্ঞানটাকে অসাধারণ বা "দিব্য" বলিতে পারি। কিন্তু একটা আদর্শ, পূর্ণ জ্ঞান থাকাও সম্ভব। সেইটে সিঁড়ির শেষ ধাপ, সিরিজের ফাইনাল্ টার্ম। সেইটে পারমার্থিক জ্ঞান। খাঁটি লক্ষণ মাফিক্— সেইটেই বেদ। পুঁথি ক'খানাকে এই লক্ষণমত বেদ বলিব কি না, সে আলাদা কথা। এই পারমার্থিক আদর্শ জ্ঞানের নীচে যা কিছু পড়ে, আমাদের জ্ঞানই হোক্, আর বৈজ্ঞানিক, যোগীদের জ্ঞানই হোক্, সে সবই ব্যাবহারিক ভাবেই যথার্থ জ্ঞান। তাতে কমিবেশি আছে।

আমি শুধু চোখে দেখে যা পাই, তুমিও তাই পাও, সেও তাই পাচ্ছে ; দেখে শুনে অনুমান ক'রেও প্রায়ই ঠকি না, ফল পাই (ন্যায়ের ভাষায় সে জ্ঞানের "সফলপ্রবৃত্তিজনকত্ব" আছে)। আমাদের সব্বাইকার দেখা-শোনা যে হুবহু ঠিক একই ভাবে হচ্ছে, এমন নয়। আমাদের সব্বাইকার চোখ কাণ এক রকম না, মনঃসংযোগও এক রকম না। এক আমিই একটা জিনিস নানা সময়ে নানা রকম দেখি। কিন্তু, প্রায়, গরমিলগুলো তুচ্ছ (neglgible), আমার চোখ কাণের "দোষ" ঘট্‌লে, তোমাদের দেখা-শোনার সঙ্গে বেজায় গরমিল হ'তে পারে। তখন, আমার দেখা শোনা আর প্রমাণ নয়। প্রমা বা যাথার্থ্যের উৎপত্তি কেমন ক'রে হয়, আর প্রমা যে হ'লো তা আমরা জানি কি ক'রে, তা নিয়ে (স্বতঃ

প্রামাণ্য, পরতঃ প্রামাণ্য, জ্ঞপ্তিস্বতন্ত্ব, জ্ঞপ্তিপরতন্ত্ব বাদ) দর্শন শাস্ত্রে মহাবিচার চ'লেছে। এটা কাজের বিচারও বটে। তবে, যে সব সামগ্রী (উপাদান বা উপকরণ) হ'তে জ্ঞান হচ্ছে, সেগুলো নির্দোষ হওয়া চাই— "দোষাভাব-সহকৃত" হওয়া চাই।— এটা সব থেকেই শেষ পর্যন্ত এসে পড়ে। বেদান্ত বলবেন— "দোষাভাবসহ-কৃতজ্ঞানসামান্যসামগ্রীপ্রযোজ্যত্বং উৎপত্তিস্বতন্ত্বম্"— জ্ঞান হ'তে গেলেই আত্মা চাই, আত্মা আর মনের সংযোগ ত' চাইই, তা ছাড়া ইন্দ্রিয়, অনুমানাদিও অনেক ক্ষেত্রে চাই। এ সামগ্রী নির্দোষ হ'লেই, সে জ্ঞান প্রমা হবে। ন্যায় বলবেন— "জ্ঞানমাত্রজনক-সামগ্র্যতিরিক্তকারণপ্রযোজ্যত্বং উৎপত্তিপরতন্ত্বম্"— জ্ঞান হ'তে গেলেই যে যে সামগ্রী থাকা আবশ্যক, কেবল সেগুলি থাক্‌লেই হ'ল না ; তাদের অতিরিক্ত একটা কারণ (যেটাকে তাঁরা "গুণ" বলেন) থাকা চাই। সেই গুণবিশিষ্ট সামগ্রী হ'তে যদি জ্ঞান হয়, তবে তার প্রামাণ্য হ'ল , নইলে হ'ল না। মোটের ওপর কথাটা এই। সূক্ষ্মের ভেতরে যাবার চেষ্টা করব না; তবে, দুয়ের তফাৎ, মোটামুটি দেখ্‌ছি এই— জ্ঞানের সামগ্রী দোষাভাব-সহকৃত, নির্দোষ হওয়া চাই, এই বললেন বেদান্ত ; আর, সে সামগ্রীতে একটা বেশীর ভাগ গুণ থাকা চাই, এই বললেন ন্যায়।

কিন্তু, নির্দোষ হওয়া অথবা সেই অতিরিক্ত সামগ্রী গুণটি ঠিক ঠিক থাকা সহজ কথা নয়। আমাদের লৌকিক কোন জ্ঞানেই পূরাপূরি যোগাযোগ হয় না। এইজন্য আমাদের সব জ্ঞানই "কারবারি" হিসাবেই যথার্থ হ'তে পারে। বিজ্ঞান, যোগসাধন সেই যাথার্থ্যটিকে ক্রমে পূরাও খাঁটি করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাই, তাদের প্রামাণ্য বেশী। সাধারণ জ্ঞানের বিষয় নয় এমন বিষয়কে প্রত্যক্ষ করাকেও যদি "দর্শন" বলি, তবে, সে রকমের বিষয় যাঁরা সাক্ষাৎকার করেন, তাঁরা "ঋষি"। এ লক্ষণ দিলে, যে বৈজ্ঞানিক অণুবীক্ষণ দিয়ে আমাকে জলের পোকা দেখাচ্ছেন, অথবা

ক্রেস্‌কোগ্রাফ দিয়ে গাছের শিরায় রসসঞ্চার দেখাচ্ছেন, তিনি ঋষি; যোগীরাও ঋষি। এঁদের নানান্ থাক্ র'য়েছে। একেবারে চরম থাকে যিনি, তিনিই "পুরাণ ঋষি", "প্রজাপতি", "আদিগুরু" পরমেশ্বর। তাঁর জ্ঞান পূর্ণ ও নিত্য প্রমা। প্রমাণ দিয়ে তাঁর প্রমা জন্মাতে হয় না। শ্রুতিস্মৃতি মানার মূল যুক্তিটা এইরকমের আলোচনার ভেতরেই আমাদের খুঁজে পেতে হবে।

সন্নিকর্ষের কথা হইতেছিল। অলৌকিকের মধ্যে একরকম—যোগজ। আর দুই রকম, আগে সকলে মানিতেন না, এখন অনেকেই (নৈয়ায়িকের কথা বলিতেছি) মানেন—সামান্য-লক্ষণা আর জ্ঞান-লক্ষণা। ঘট দেখলে ঘটত্ব (বা ঘটজাতি) রূপে সকল ঘটেরই প্রত্যক্ষ হয়। কখনও ঘট দেখি নাই, আজ দেখলাম। কা'ল যদি পাঁচটা দেখি ত' মনে হয়— "ও, এও সেই ঘট"। যে গ্রামোফোন কখনও শোনে নি, সে আজ শুন্‌লে, সামান্য বা মোটামুটি রকমে, এই গ্রামো-ফোন শোনার সঙ্গে সঙ্গে, তার যত গ্রামোফোন আছে, সব শোনা হ'য়ে যায়। "গ্রামোফোনের গান বা আওয়াজ"— এই সামান্য রকমেই হয়, বিশেষভাবে, নয়। কাল আর একটা গ্রামোফোন শুন্‌লেই (কেউ বলবেন পরক্ষণে) তার মনে হয়—"ও, এ সেই গ্রামোফোনের আওয়াজ"। দুটো গ্রামেফোনের শব্দ হয়ত আলাদা। আলাদা ক'রেই তাদের "বিশেষ" বা "ব্যক্তিত্ব" শুন্‌তে জান্‌তে হয়। জ্ঞানলক্ষণার—দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, সুরভি চন্দনের জ্ঞান। ইংরাজী সাইকোলজিতে প্রত্যক্ষকে "Presentative-representative complex" বলা হ'ত। যেমন, চোখে একটা জিনিসের রং আর দুটো একটা ধর্ম দেখি মাত্র। জিনিসটার দূরত্ব, গোলত্ব বা অনুরূপ আকার, কঠিনত্ব ইত্যাদি চোখে দেখি না। অন্য-রকমে তাদের "অধ্যাহার" হয়। অথচ, মনে হয় চোখেই দেখলাম —এক কালো পাথরের গোলা পূবদিকে খানিকদূরে প'ড়ে র'য়েছে। চোখে সাক্ষাৎ যেটা দেখলাম তার সঙ্গে আরও কিছু কিছু ধর্ম

সংযোগ হ'য়ে এ জ্ঞানটা আমার জন্মায়। ইংরাজি সাইকোলজিতে Acquired Perceptionএর কথা আছে। একটা বড় গাছ বা পাহাড়ের এক অংশ দেখেই গাছটা বা পাহাড়টা দেখলাম বলি। তারপর, সামান্য-লক্ষণা আর জ্ঞান-লক্ষণা সন্নিকর্ষ মান্‌তে গেলে এও বল্‌তে হয় যে, চোখের সাম্‌নে হাজির নেই এমন অনেক ধর্মও —যেন কিসের টানে—প্রত্যক্ষস্থলে এসে হাজির হয় (অধ্যাহার) —এতে হয়ত মনে হ'তে পারে—প্রত্যক্ষটা আসলে বা পুরোপুরি প্রত্যক্ষই না; তার বেশীর ভাগ স্মরণ অথবা অনুমান। সুরভি-চন্দনের বেলা চন্দনটা চোখে দেখছি, আর তার সৌরভটা স্মরণ কর্‌ছি; কারুর রান্নাঘরের কাছ দিয়ে যেতে যেতে যদি ধোঁয়া দেখতে পাই, ছ্যাক্ ছোঁক্ শব্দ শুন্‌তে পাই, ফোড়নের গন্ধ পাই ত' বলি—ওদের বাড়ী রান্না-বান্না হচ্ছে দেখে এলাম। বলতে হবে না, এর ভেতর অনুমান আছে। আমাদের অনেক প্রত্যক্ষ—যেটাকে প্রত্যক্ষ ব'লেই ধ'রে থাকি—এর ভেতর এই রকমধারা অনুমান অল্পবিস্তর গা ঢাকা দিয়ে থাকে। আদালতে একজন হয়ত মিথ্যে সাক্ষ্য দিচ্ছে না, কিন্তু তার অনুমানগুলোকে খাঁটি প্রত্যক্ষ ব'লে চালাতে চাচ্ছে। জেরায় ধরা পড়ে। প্রত্যক্ষ ব্যাপারটাকেই স্মরণ বা অনুমানের ভেতর ফেলা হবে কিনা, তা নিয়ে সেই প্রাচীন কাল থেকেই (ন্যায়সূত্র, ২।১।৩০, ৩১ প্রভৃতি সূত্রে) বিচার হ'য়েছে।

কার্যক্ষেত্রে এটা দরকারী কথা। একটা ঘটনা ঘটিল। দশজনে দেখিয়াছে। দশজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে দেখা যায় তাদের সবাইকার রিপোর্ট এক হয় না। প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে কিছু না কিছু ভেজাল (কল্পনা, আন্দাজ, অনুমান ইত্যাদি) চালাইয়াছে। হয়ত তাদের অজ্ঞাতসারেই। আজকাল বিজ্ঞানে তাই অনেকের রিপোর্ট লইয়া গড় করিয়া নেওয়ার ব্যবস্থা আছে; ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা (probabilities of error) আঁক কষিয়া

ঠিক করিতে হয়। এক কথায়, সমীক্ষা বা Observation কাজটাকে কেহই সোজা মনে করেন না। আমাদের সকলকারই প্রত্যক্ষে একটু আধটু ভেজাল এভাবে থাকে ; এজন্য একজন "মাঝারি মানুষ" (mean observer) কল্পনা করিয়া লইতে হয়। ভেজালের মাত্রা বেশী হইলে সেটা "বাজার চলন" ঘির মতন হইয়া যায় ; তাতে ঘি আর থাকে না বলিলেই হয়। দড়ি দেখে সাপ দেখলাম ভাবা ; ঝিনুক দেখে রূপো দেখলাম, জোৎস্না রাত্রিতে বাতাসে দুলছে এমন সাদাটে কলার পাতা দেখে পেত্নী দেখেছি ভাবা ; এ সবের মধ্যে প্রত্যক্ষ সত্য সত্যই যে কিছুই নেই এমন নয় ; কিন্তু তার সঙ্গে বিস্তর ভেজাল এসে প'ড়েছে, তাই এগুলো মিথ্যে, প্রমা নয়। ঝিনুক দেখে "সাদা চক্‌চকে কি একটা দেখলাম", এই যদি বলতাম, তা হ'লে ঠিকই বলা হ'ত।

এই নিয়ে আমাদের দর্শনগুলি বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। মায়াবাদ বেদান্তে জগতের জ্ঞানটাকেই মিথ্যা জ্ঞান বলা হয়, কাজেই মিথ্যাজ্ঞানের স্বরূপ আর প্রণালী লইয়া বেদান্তকে খুব খাটিতে হইয়াছে। মোটামুটি, একে "খ্যাতিবাদ" বলে— Theory of Illusion, Hallucination etc.। মায়াবাদ বেদান্ত নিজের সিদ্ধান্তটিকে "অনির্বচনীয় খ্যাতি" বলেন। তা ছাড়া, আর পাঁচ রকমের খ্যাতি আছে। সৎখ্যাতি, অসৎখ্যাতি, অন্যথাখ্যাতি, আত্মখ্যাতি, অখ্যাতি। আমরা মায়াবাদ বেদান্তের কথায় এই পঞ্চখ্যাতির পরিচয় লইব। ন্যায়ে অন্যথাখ্যাতি। শুক্তিও দেখেছি, রজতও দেখেছি। দুটো সদৃশও (similar) বটে কোনো কোনো ধর্মে, আবার বিসদৃশও বটে। এখন যদি চোখের দোষ, অমনোযোগ প্রভৃতি কোন দোষে সাম্‌নে ঐ শুক্তিটা দেখে রজতের সঙ্গে তার সাদৃশ্যটাই মনে পড়ে, তফাৎটা মনে না পড়ে ; দোষবশতঃ সাদৃশ্যটার ভান বা খ্যাতি হয়, তফাৎটার ভান হয় না, আর, সেই স্থানে যদি শুক্তির নিজস্ব (রজতে যা নেই) ধর্মগুলির ভান না হ'য়ে

রজতের নিজস্ব (যা শুক্তিতে নেই) ধর্মগুলির ভান হয়, তা হ'লে ভুল হ'ল—অন্যথাখ্যাতি হ'ল। ধর, শুক্তির ধর্ম ক, খ, গ; রজতের ক, খ, ঘ। ক, খএ দুয়ের মিল; গ আর ঘ দুয়ের নিজস্ব বা বিশেষ। সাম্‌নে তাকিয়ে ক, খ দেখতে পেলাম। যদি শুক্তিটেই সত্যি সত্যি থাকে ত', ক, খ দেখার সঙ্গে সঙ্গে (অথবা পরক্ষণেই) গ আমার মনে আসা চাই (দেখেই হোক্, স্মরণ ক'রেই হোক্, আর অজ্ঞাতসারে ঝটিতি সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হ'য়েই হোক্)। কিন্তু, তা না হ'য়ে যদি ঘ মনে আসে, তা হ'লে, ক খ গ না হ'য়ে ক খ ঘ হ'ল, কি না, রজত হ'ল।

আগে যে জ্ঞানলক্ষণা সন্নিকর্ষের কথা ব'লেছি, সেই প্রণালীতে ব্যাপারটা হয়। সুরভি-চন্দনের বেলা চন্দনের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হ'চ্ছে; চন্দনটা দূরে র'য়েছে ব'লে তার সৌরভের ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ হচ্ছে না। অথচ, "সুরভি-চন্দন দেখলাম" এই রকমই বোধ হয়। ন্যায় বলেন —চন্দনাংশে জ্ঞানটা লৌকিক ভাবেই (অর্থাৎ, সাধারণ রকমেই) প্রত্যক্ষ; কিন্তু সৌরভটুকু (তখন নাকে পাচ্ছি না, অথচ প্রত্যক্ষ হচ্ছে ব'লে) অলৌকিক বা অসাধারণ রকমে প্রত্যক্ষ। গোটাটা জড়িয়ে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষই, তার খানিকটা লৌকিক সন্নিকর্ষজন্য, খানিকটা অলৌকিক সন্নিকর্ষজন্য। এখন, শুক্তিকে যখন রজত ক'রে দেখি, ক খ (সাধারণ ধর্ম দুটি) লৌকিক রকমেই দেখি, আর দোষ পেয়েছে ব'লে, গ এর "অসাধারণ" প্রত্যক্ষ না হ'য়ে ঘএর প্রত্যক্ষ হ'য়ে থাকে। অনেকে হয়ত বলবেন, এই আজগুবি, অলৌকিক প্রত্যক্ষটা না ব'লে বল্‌লেই হয়—গ এর স্মৃতি না হয়ে ঘএর হচ্ছে (অথবা তাড়াতাড়ি ঘএর সংস্কারটা মনে ওঠে) তাই ভুল হচ্ছে। জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ যাঁরা মানেন, তাঁরা বলেন—"এই সাপ দেখ্‌লাম, রূপো দেখ্‌লাম"—এ রকমধারা প্রত্যক্ষ অনুভবই যে হয়; "লম্বা সরু একটা কি দেখে সাপের কথা মনে হ'ল; সাদা চক্‌চকে একটা কি দেখে রূপো মনে হ'লো", এমন ত' অনুভব হয় না।

কাজেই, অনুভবের বলে ওগুলোকে প্রত্যক্ষই বলতে হবে। যাই হোক্, অন্যথাখ্যাতির মোটামুটি পরিচয় পেলাম। অন্য অন্য দর্শনের সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক হ'য়েছে বিস্তর। পাশ্চাত্য সাইকোলজীর Theory of memory and association এ সব আলোচনায় প্রাসঙ্গিক।

এ সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাইয়াই আমরা দেখিলাম—প্রত্যক্ষ অনুভবে নিশ্চয়জ্ঞান সব চাইতে বেশী হয় বটে, কিন্তু তার ভেতরেও কত রকমে খুঁৎ থাকিতে পারে, অথবা ঢুকিতে পারে। এইজন্য আমাদের প্রত্যক্ষের কাজ-চালানো রকমের সত্যতা মানিতে হইবে। পূর্ণ বা অভ্রান্ত সত্যতা পাবার জন্য বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ, যোগের প্রত্যক্ষের নানা সোপান বাহিয়া উঠিয়া শেষকালে যিনি যোগেশ্বর, এবং যাঁহা হইতে নিখিল জ্ঞানবিজ্ঞান নিঃসৃত হইয়াছে, তাঁতে প্রপন্ন হইতে হইবে। তাঁর কাছ হইতে (হিরণ্যগর্ভ, মরীচি ইত্যাদি সম্প্রদায় ক্রমে) যে উপদেশ (Inspiration) তাই শ্রুতি। শ্রুতি হইল কি না হইল, এটা অবশ্য অনুসন্ধানের বিষয়; কিন্তু যদি হয়, তবে, বলা বাহুল্য, সেইটাই প্রমাণের চরম আদালত।

ন্যায়-বৈশেষিক সাধারণের দৃষ্টি (common-sense view) লইয়া ব্যবহারের সফলতাটাকে "সালিশ" মানিয়া (pragmatic or practical view) লইয়াছেন বটে, কিন্তু শাব্দ প্রমাণকে (আপ্ত বাক্য আর শ্রুতি বা ঈশ্বরবাক্যরূপে) যথোচিত সম্মান করিয়াছেন। বৈশেষিক দুইটা প্রমাণ মানিয়াও তাহা করিয়াছেন। ন্যায়-বৈশেষিকের দৃষ্টি যে কতখানি কাজের বা ফলের হিসাব রাখে, তা তাদের পরতঃ-প্রামাণ্যবাদ থেকেও বুঝিতে পারি। এ সম্পর্কে দু'এক কথা আগে ব'লেছি। এখানে, প্রামাণ্য কি অপ্রামাণ্য— এটা স্থির করার প্রণালী তাঁরা যেমন বলেন, সেইটে শুন্‌ব।

ঘট দেখলে "এই ঘট" এইরকম জ্ঞানটা প্রথমে হয়। একে "ব্যবসায়" বলে। তারপর "আমি ঘট জান্‌ছি" এইরকম জ্ঞানের

জ্ঞান হয়—"অনুব্যবসায়"। তারপর, প্রমাণ, অপ্রমাণ—এই দুটো কোটি বা বিকল্প (contraries) মনে পড়ে। তারপর, এই যে ঘটের জ্ঞানটা আমার হ'ল, এটা যথার্থ কি যথার্থ—এইরকমে প্রামাণ্য-সংশয় হয়। শেষকালে, বিশেষ বা "গুণ" (যে যে সামগ্রী হ'তে জ্ঞানমাত্র হয়, তার অতিরিক্ত একটা কিছু) দেখলে সে সংশয় দূর হয়। কাছে গিয়ে নেড়েচেড়ে, হাতে তুলে, তাকে ব্যবহার ক'রে যদি দেখি, তার দ্বারা যে কাজ হবার কথা তা হচ্ছে, তখন আর সংশয় থাকে না। ঘটের দ্বারা কতকগুলো কাজ হয় ; যেমন, জল, দুধ, দই, তাতে ঢেলে রাখা যায় ; যেটাকে ঘট ব'লে দেখেছি, তাতে যদি এই কাজগুলো চলে ত', সেটা ঘটই। মিছে ঘট হ'লে কাজ চলে না। কৃষ্ণনগরের কুমোররা চমৎকার মাটির কলা, নেবু, আম ইত্যাদি ফল তৈরি করতে পারে। দূর থেকে দেখ্‌লে মনে হয়, সত্যিই এক ছড়া কলা র'য়েছে। হাতে নিলে বুঝতে পারি কলা নয়, খেতে গেলে ত' কথাই নেই। দড়ি না সাপ এ সংশয় হ'লেও (বিশেষ আঁধারে যদি ভাল করে দেখতেই না পাওয়া যায়), লাঠি দিয়ে নেড়ে কিংবা ঢেলা মেরে দেখতে হয়, স'রে নড়ে গেল কিনা, ফোঁস কর্‌লে কিনা। আবার মরা সাপ হ'লেও হ'তে পারে। ফল কথা, পরীক্ষা (test) হচ্ছে প্রবৃত্তির সফলতায়। মাটির পাকা কলা দেখে খেতে প্রবৃত্তি হ'ল ; প্রবৃত্তি সফল হ'ল না ; কাজেই, সত্যিকার কলাই না। ভেতরে ভেতরে চটাপট একটা অনুমান বোধহয় করে নিই—যেমন, ঐ দূরে মাঠে জল দেখছি, ওটা জলই, মরীচিকা নয় ; কেননা, সফলপ্রবৃত্তিজনকতা ওতে আছে—পিপাসা পেলে জল খেতে যদি ওখানে যাই, জল পাব। আর আর যথার্থ জ্ঞানের বেলায় তাই হয় (প্রবৃত্তি সফল হয়) দেখেছি। পশ্চিমদেশে pragmatic truth এর চলন দর্শনশাস্ত্রে আছে। আমরা বেদান্তে ব্যাবহারিক সত্তার কথায় এ প্রসঙ্গ আবার তুলব।

সন্নিকর্ষের কথা হইতেছিল। অলৌকিক সন্নিকর্ষ সম্বন্ধে কটা

কথা আমরা বলিয়াছি—মোটা মোটা কথা। নৈয়ায়িকেরা খুব সূক্ষ্মে গিয়ে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করেন। সাধারণ বা লৌকিক সন্নিকর্ষ ছয় রকমের বলা হয়। আমরা এখানে কেবল নাম কয়টাই শোনাইয়া রাখিব—সংযোগ, সংযুক্ত-সমবায়, সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়, সমবায়, সমবেত-সমবায়, বিশেষণতা বা স্বরূপ। ভাষাপরিচ্ছেদ ইত্যাদি পুঁথিতে এদের ব্যাখ্যাদি আছে। আমরা পরে এদের দৃষ্টান্ত দেব। ইন্দ্রিয় আর বিষয়ের সম্বন্ধ কত রকমের হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, তাই আমরা শুনিলাম। কোন কিছুতে বিশিষ্ট বুদ্ধি যাতে ক'রে জন্মে, তাই সম্বন্ধ। সম্বন্ধ অনেক রকমের আছে; কতকগুলি সহজেই বুঝিতে পারি। যেমন, হাতে বইখানা র'য়েছে। সংযোগ সম্বন্ধে র'য়েছে; হাতটা আধার, বইখানা আধেয়। সম্বন্ধের এই দুটো "নিরূপক"। তার মধ্যে যাতে (আধারে) সম্বন্ধটা হচ্ছে সেটা সে সম্বন্ধের "অনুযোগী"; আর যেটা (আধেয়) সে সম্বন্ধে সে আধারে আছে, সেটা তার প্রতিযোগী"। হাতে বই নেই—এখানে বইটার সংযোগ হাতে নেই—সংযোগের অভাব বোঝাচ্ছে। এ অভাবের প্রতিযোগী বই, অনুযোগী হাত। যেখানে যে জিনিষটা মোটেই থাকেনা, সেখানে তার অত্যন্তাভাব। [অভাব (সম্বন্ধ-সাদৃশ্যাদিভিন্নত্বে সতি প্রতিযোগিজ্ঞানাধীনজ্ঞানবিষয়ঃ অভাবঃ) দুরকম—সংসর্গাভাব আর অন্যোন্যাভাব। শেষেরটা, যেমন জল বাতাস নয়, বাতাস জল নয়; একটায় অপরটার অভাব আছে। সংসর্গাভাব তিন রকম—প্রাগভাব (কার্য্যটির জন্মানর আগে যে না থাকা; যেমন, কুমোর ঘটটা গড়বার আগে—কপালদ্বয় সংযোগের পূর্বে—তার যে না থাকা, সেইটে তার প্রাগভাব), ধ্বংসাভাব (ঘটটা ভেঙ্গে গেলে যে তার না-থাকা তাই), আর অত্যন্তাভাব (যাতে যে জিনিষটা কখনই থাকে না, তার সেই না-থাকা)]। জলহ্রদে ধোঁয়া কখনই থাকে না—যদিও কোয়াসাকে ধোঁয়া বলিয়া ভুল হইতে পারে; হ্রদে নৌকা বা ষ্টীমার থাকিলে তাতে ধোঁয়া

থাকিতে পারে ; তবে সে থাকা আর জলে ধোঁয়া থাকা এক কথা নয়। এতদ্‌বৃক্ষে কপি-সংযোগ আছে—বলিলে গাছের গোড়ায় আছে (মূল-দেশাবচ্ছিন্ন এতদ্‌বৃক্ষে) বোঝায় না, ডালে বা আগায় আছে (অগ্রদেশাবচ্ছিন্ন এতদ্‌বৃক্ষে) বোঝায়। যাই হোক্, জল-হ্রদে ধূমের (বহ্নির অনুমানে যেটা হেতু বা সাধন বা লিঙ্গ) অত্যন্তাভাব আছে। বুড়ো নৈয়ায়িকেরা "সাময়িকাভাব" মান্‌তেন, ছোকরারা অনেকেই তা আলাদা করে মানেন না। পর্বতে, মহানসে (রান্নাঘরে), গোষ্ঠে ধোঁয়া কখনও থাকে, কখনও বা থাকে না। কাজেই, এ সব যায়গায় (অধিকরণে) ধোঁয়ার অত্যন্তাভাব নেই। জলের হ্রদে ধোঁয়ার যে অত্যন্তাভাব, তার প্রতিযোগী হইল ধোঁয়া, অনুযোগী জলহ্রদ। থাকাকে "বৃত্তি", না থাকাকে "অ-বৃত্তি" বলা হয়। পর্বত, মহানস, গোষ্ঠ ইত্যাদিতে ধূমের বৃত্তি (স্থিতি বা থাকা) হইতে পারে—all the instances of its occurrence or happening.। সাধ্য—যেটা অনুমান করিতে হইবে—যেমন দূরস্থ পর্বতে আগুন। আগুনের অভাব সাধ্যাভাব। যাতে সাধ্যাভাব আছে, সেটা সাধ্যাভাববৎ বা সাধ্যাভাববান্—যেমন জলাশয়। তাতে অবৃত্তি বা না-থাকা—"সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব"। বোঝা গেল না কি ?

না-থাকা নানারকমে—সম্বন্ধে, ধর্মে—হইতে পারে। পর্বতে আগুন থাকে বটে, কিন্তু সংযোগ সম্বন্ধে থাকে। কোন নিত্য, কায়েমি সম্বন্ধে থাকে না ; যেমন, জলে বা আত্মায় তাদের স্বাভাবিক গুণগুলো যে রকম সম্পর্কে থাকে, সে রকম সম্পর্কে থাকে না। কথাটা সোজা। আবার, আগুন মাত্রেরই কতকগুলো স্বাভাবিক (সাংসিদ্ধিক) ধর্ম আছে। সেগুলো থাকেই ; কতক-গুলো নৈমিত্তিক। এই নৈমিত্তিকের ভেতর আগন্তুকও পড়ে। ছেলেরা উৎসব পরবে লাল দিয়াশালাই জ্বালায়—আগুনের ঘোর রক্ত আভা ; নীল দিয়াশালাই জ্বালালে—ঘোর নীল আভা। এ সব

ঘোর রক্ত, নীল বা পীত সাংসিদ্ধিক নয়, নৈমিত্তিক এবং আগন্তুক। এই নৈমিত্তিক ও আগন্তুক ধর্মগুলো আগুন থাকিলেই যে থাকিবে এমন নয়। সাধারণ প্রদীপের আগুনে নেই; বিজলি বাতিতেও নেই (লাল, নীল ফনেস দেওয়া থাকলে আভা লাল নীল দেখায় বটে)। কাজেই রান্নাঘরে, মাঠে ইত্যাদি যায়গায় ধোঁয়ার সঙ্গে আগুন থাকৃতে দেখেছি ব'লে, দূরে পাহাড়ে ধোঁয়া দেখে যদি বলি —পাহাড়টায় ধোঁয়া কায়েমি সম্বন্ধে আছে, যেমনধারা গুণ তার আশ্রয় দ্রব্যে থাকে; অথবা যদি বলি ঘোর লাল বা নীল বা পীত রংয়ের আগুন আছে;—তা হ'লে আমার সে ক্ষেত্রে যতটুকু বলার অধিকার, তা আমি লঙ্ঘন করে গেলাম। এক সম্বন্ধে ধূম আর বহ্নির সহচার আমি নানা যায়গায় দেখেছি; বহ্নিকে তার সামান্য, সাংসিদ্ধিক গুণগুলো নিয়েই সব ক্ষেত্রে থাক্‌তে দেখিছি—নৈমিত্তিক আগন্তুক গুণগুলো আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা দেখেছি। কাজেই, সহচার বা ব্যাপ্তি ঐ সংযোগ সম্বন্ধ নিয়েই, আর ঐ সাংসিদ্ধিক গুণ বা ধর্মগুলো নিয়েই।

ধর, ক আর খ, ধূম ও বহ্নি। অধিকরণে (মহানসাদিতে) ক আর খ'কে সংযোগ সম্বন্ধে দেখেছি। তার পর ধরা যাক্— মহানসে বহ্নিকে পেয়েছি 'চ ছ জ' ধর্মবিশিষ্টরূপে ; অপর যায়গায় "চ ছ ঝ" "চ ছ ঞ" ইত্যাদি রূপে—কোথাও লাল, কোথাও নীল, কোথাও পীত আভা। 'জ' গুণটা বদ্‌লাচ্ছে, ব্যভিচারী, নিয়ত নয়। 'চ ছ' বদ্‌লাচ্ছে না, অব্যভিচারী, নিয়ত। এখন যদি দূরস্থ পর্বতে ধোঁয়া দেখে আগুন অনুমান করতে হয় ত—সংযোগ সম্বন্ধেই (পর্বতটায়, সংযোগ সম্বন্ধে, কোন কায়েমী সম্বন্ধে নয়, আগুন আছে, এইভাবে), আর 'চ ছ' এই নিয়তধর্মবিশিষ্ট যে আগুন তারই অনুমান করা চল্‌বে। এক্ষেত্রে সাধ্যতা-অবচ্ছেদক (determining or conditioning) সম্বন্ধ হ'ল সংযোগ; সাধ্যতার অবচ্ছেদক ধর্ম হ'ল 'চ ছ'। এইজন্য, "সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-

সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মাবচ্ছিন্ন”—এ সব ব্যাপ্তির আলোচনায় দরকারী কথা।

শুধু তাই নয়, আরো ভেবে দেখা দরকার। সংযোগ কথাটা মোটামুটি ভাবে আমরা ধরেছি। কিন্তু রান্নাঘরে পাচকঠাকুর যেমনধারা সংযোগ সম্বন্ধে রয়েছেন, আগুন ঠিক তেমনিধারা সংযোগ সম্বন্ধে নেই। পাহাড়ে পাখী বা মানুষ যেমনভাবে সংযুক্ত থাকে, আগুন বা পাথর সেভাবে থাকে না; মানুষটি হয়ত চলে ফিরে বেড়াচ্ছে; আগুন বা পাথর হয়ত এক যায়গাতেই আছে। সংযোগের রকম বা প্রকার আলাদা। ঘটপ্রতিযোগিকসংযোগ, বহ্নিপ্রতিযোগিকসংযোগ, এইভাবে বলা উচিত; তা ছাড়া, কোথায় (কোন্ দেশে), কখন সংযোগ তাও দেখ্তে হয়। কালিক সম্বন্ধ বা কালিক বিশেষণতা, বিশেষ সম্বন্ধ সব জিনিষেই থাকে। আর দিক্‌গত-বিশেষণতা বা দৈশিক সম্বন্ধও, সব তাতে যদি বা না থাকে (অনেকে বলেন, থাকে), অন্ততঃপক্ষে মূর্ত পদার্থমাত্রেই থাকে। এখন, দূরে পাহাড়ে কোন যায়গায় ধোঁয়া দেখিয়া যদি বলি—পাহাড়ে আগুন পাখী বা মানুষের মতন সরে নড়ে বেড়াচ্ছে; পাহাড়ে বরাবরই আগুন আছে, অথবা অন্য সময়ে ছিল বা থাক্‌বে; পাহাড়ের অপর যায়গাতেও আগুন আছে:—তা হলে, আমার যা বলার এক্তার নেই, তাই আমি বল্লাম। যা বল্‌তে যাচ্ছি, আর যে হেতু দেখিয়ে বল্‌তে যাচ্ছি (সাধ্য আর হেতু), দুয়েরেই সম্বন্ধ আর ধর্মের কথা বেশ সতর্ক হয়ে বলতে হয়—দেশ, কাল, প্রকারতা, এসবে যেন গোল না হয়। এ সবে গোল হবার দরুণ আমাদের কত অনুমান যে ভুল হচ্ছে, আর তার জন্যে কার্যক্ষেত্রে আমাদের ঠক্‌তে হচ্ছে, তার ঠিকানা নেই।

ক যদি খতে কোন সম্বন্ধে না থাকে ত' সেই সম্বন্ধটিকে ব্যধিকরণ সম্বন্ধ বলা হয়। যদু শ্যামের ভাই, শ্যালক নয়। হরি হয়ত তার শ্যালক। শ্যামের সম্পর্কে যদুর শ্যালক সম্বন্ধটি ব্যধিকরণ

সম্বন্ধ। আমরা, আগে বলেছি, পাখী যে সংযোগ সম্বন্ধে পাহাড়ে থাকে, আগুন ঠিক সেই সংযোগ সম্বন্ধে থাকে না; কাজেই পক্ষি-প্রতিযোগিক সংযোগ সম্বন্ধটি বহ্নির প্রতি ব্যধিকরণ সম্বন্ধ, আর বহ্নি-প্রতিযোগিক-সংযোগ সম্বন্ধটি পক্ষীর প্রতি ব্যধিকরণ সম্বন্ধ। আমরা কার্যক্ষেত্রে এই রকমধারা সূক্ষ্ম ভেদগুলো ভুলে অনেক সময় উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিই। অবচ্ছেদক কথাটা ন্যায়ের পরিভাষায় সচরাচর ব্যবহার হয়, মানে, what determines or defines what is otherwise indeterminate, undefined. যেমন, যেটা সাধতে হবে বা অনুমান কর্‌তে হবে, তার ধর্ম হল সাধ্যতা। এ ত' একটা সাধারণ সংজ্ঞা—অনেক কিছুই সাধ্য হতে পারে। কিন্তু যদি বিশেষ করে বলি—কোথাও আগুন বা আগুন থাকাটা অনুমান কর্‌তে হবে, তা হলে, সাধ্যতাবচ্ছেদক হল বহ্নিত্ব অথবা বহ্নিমত্ত্ব। এই রকমধারা অবচ্ছেদ না করলে, কি সাধ্য, কি হেতু, কি তাদের ধর্ম সম্বন্ধে—কোন কিছুই নির্দিষ্ট করে চেপে ধরা যায় না!

আমরা দশজনে একটা নৌকায় গঙ্গা পার হচ্ছি। নৌকোটা এখন আমাদের দশ জনের অধিকরণ। আর, এখন, ঐ নৌকোটার সম্পর্কে আমরা দশজনে "সমানাধিকরণ°। সমানাধিকরণে থাকাটা "সামানাধিকরণ্য"। এর মানে আর এক রকমেও ভাবা যায়। দুটো বৃত্ত—ক আর খ। আলাদা আলাদা রয়েছে। যদি খ' টাকে তুলে নিয়ে ক' এর ওপর চাপিয়ে দিই, আর ক খ ঠিক মিলে যায়, ছোট বড় হয় না, তা হলে বলতে পারি, এখন ক খ এর সামানাধিকরণ্য হয়েছে। Relation of coincidence। গণিতে এই ব্যবহারটা হয়। সচরাচর ন্যায়ের আলোচনায় সামানাধিকরণ্য মানে একাধিকরণ-বৃত্তিতা, কি না, একই অধিকরণে থাকা। একে ঐকাধিকরণ্যও বলে। যেমন, পর্বতরূপ পক্ষে ধূম আর বহ্নি দুই-ই যখন আছে ঠিক হয়, তখন বলা যায় সামানাধিকরণ্য আছে। প

জিনিষটা কখগ তিন ক্ষেত্রে (অধিকরণে) থাকল ; ফ জিনিষটা ঐ তিন ক্ষেত্রেই নেই। এখানে সমান অধিকরণে প' এর থাকা আর ফ' এর না থাকা দেখছি। কাজেই, এদের থাকা আর না থাকার সামানাধিকরণ্য। পাঁচটা জলাশয়েই জল আছে, আগুন বা ধোঁয়া নেই। এই যে জলের বৃত্তিত্ব আর বহ্নির অবৃত্তিত্ব, এ দুয়ের সামানাধিকরণ্য দেখছি। শ্যামে যদুর ভাই সম্পর্কে থাকা আর শ্যালক সম্পর্কে না থাকার সামানাধিকরণ্য। অত্যন্তাভাব বা মোটেই না থাকার কথা বলেছি—যেমন পুকুরের জলে আগুন (সাগরের জলে নাকি বাড়বানল থাকে)। ক খ গ'এ প যদি থাকে, ফ মোটেই না থাকে, তবে, এর অত্যন্তাভাবটা হ'ল প'এর সমানাধিকরণ। প্রতি অধিকরণেই যেমন কোন কিছু আছে, তেমনি আবার কোন কিছু নেই বা থাকে না। এই মোটে না থাকাটা মোটামুটি অত্যন্তাভাব। কি থাকে না ?—জিজ্ঞেস কর্‌লে—ফ থাকে না, ভ থাকে না, ম থাকে না, এইরকমে "অবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন" করে বল্‌তে হয়। ফ, ভ, ম'এ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা আছে। কাজেই, ফ, ভ, ম এরা অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক। ধর প এখানে হেতু=ধোঁয়া। ধোঁয়া রান্নাঘরে, পাহাড়ে, গোষ্ঠে ইত্যাদি যায়গায় থাকে। সেই সব যায়গায় মোটে না থাকা সম্বন্ধেও কেউ কেউ থাক্‌তে পারে। এই মোটে না থাকা সম্বন্ধটা হল ধোঁয়ার সমানাধিকরণ—যেখানে যেখানে ধোঁয়া রয়েছে, সেখানে ঐ অত্যন্তাভাব রয়েছে। কা'র অত্যন্তাভাব, তা এখন বলছি না, অর্থাৎ, অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকটিকে এখন চেপে ধর্‌ছি না। তবেই, এ ক্ষেত্রে পেলাম—"হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব"— absence relating to the to whole extent where the hetu exists,। এখন ধর আগুনের কথা ভাবা যাক্। আগুন আমাদের সাধ্য—অনুমান করে পেতে হবে। হেতু ধোঁয়া, যেখানে যেখানে আছে, সেখানে সেখানে আগুন কি নেই ? যে মোটেই না থাকা বা

অত্যন্তাভাবের কথা হচ্ছিল, তার প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক কি আগুন? তা ত' নয়; বরং উল্টো। যেখানে যেখানে ধোঁয়া দেখেছি, সেখানে সেখানে আগুন দেখেছি। কাজেই আগুনরূপ যে সাধ্য, সেটা ঐ অত্যন্তাভাব বা মোটে না থাকার অ-প্রতিযোগী (সোজা মানে, আগুনের অভাব নেই)। ভাল, বহ্নির অধিকরণে কিন্তু ধোঁয়া না থাক্‌তে পারে; যেমন, বিজলি আগুন, অতি তপ্ত আয়োগোলক ইত্যাদিতে আগুন আছে, ধোঁয়া নেই। ধোঁয়ার বৃত্তি বা থাকার অধিকরণ বোঝানর জন্যে যদি একটা বৃত্ত আঁকি, আর আগুনের বৃত্তি বা থাকা বোঝানর জন্যে যদি একটা বৃত্ত আঁকি, তবে, বলতে পারি, দুটো বৃত্ত পর পর রাখলে ঠিক মিলে যায়না; আগের বৃত্তটা শেষের বৃত্তের ভেতরে পড়ে। ধূমের অধিকরণ বহ্নির অধিকরণ বটে, কিন্তু বহ্নির অধিকরণ ধূমের অধিকরণ না হ'তেও পারে। কিন্তু ধূমের ক্ষেত্রে (extent) মোটে না থাকারূপ যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ বহ্নির ক্ষেত্রে (extent) বর্ত্তে না, অর্থাৎ, যেখানে যেখানে ধূম আছে, সেখানে সেখানে বহ্নি থাক্‌বে না, এমন হতে পারে না,—তা হলে ঠিক বলা হল না কি? আবার বৃত্ত নেওয়া যাক্। ধূমের ক্ষেত্রে (where there is smoke) যেটি নেই, সেটিকে একটা বৃত্ত দিয়ে ঘিরলাম, না থাকাটা ঐ বৃত্তেরই ভেতরে, বাইরে নয়। তা হলে বহ্নির ক্ষেত্রে (where there is fire) ঐ বৃত্তের সম্পূর্ণ বাইরে পড়ে না কি? ন্যায়ের ভাষায়—"হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব-অপ্রতিযোগি-সাধ্যসামানাধিকরণ্য" মোটামুটি বোঝা গেল না কি?—হেতুসমানাধিকরণ যে অত্যন্তাভাব (না-থাকা) সেই না-থাকা সম্বন্ধ রাখে না এমন যে সাধ্য, সেই সাধ্যের সঙ্গে হেতুর সামানাধিকরণ্যই হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি। সামানাধিকরণ্য মানে এখানে coincidence নয়, এক অধিকরণে বৃত্তিতা, থাকা। ব্যাপ্তি সম্বন্ধ—একটা ব্যাপ্য (ধূম), অপরটা ব্যাপক (বহ্নি), এ দুয়ের সম্বন্ধ। পরস্পরের অধিকরণে বা ক্ষেত্রে কতদূর বা কতখানি

বৃত্তি বা extension, তাই ঘটিত প্রশ্ন এখানে। ক খ'এর বৃত্তি নানান্ রকমে হতে পারে। ক যেখানে আছে খ সেখানে মোটে নেই, আর খ যেখানে, ক সেখানে নেই। দুটো বৃত্ত পরস্পরের বাইরে। তারপর, ক খ পরস্পরের অধিকরণে কিয়দংশে থাকতে পারে—দুটো বৃত্ত কাটাকাটি কর্‌ছে। তার পর, ক' এর ভেতরে খ পড়ল, ক বৃত্তটা বড় (ব্যাপক), খ'টা তার অন্তর্গত (ব্যাপ্য)। তার পর, এমনও হতে পারে যে, দুটো বৃত্ত পরস্পর মিলে গেল—ক'কে ছেড়ে খ নেই, খ'কে ছেড়েও ক নেই। এই চার রকমের প্রস্তাবের ভেতর প্রথম দু রকমে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ নেই, কাজেই, একটাকে পেয়ে অপরটার অনুমান করা চলে না। শেষের দুরকমে চলে। কিন্তু তফাৎ আছে। একেবারে শেষের প্রস্তাবে (hypothesisএ), খ' এর অনুমানে ক হেতু, আবার খ'এর অনুমানে ক হেতু হতে পারে; দু'য়ের কোন একটা দেখ্‌লেই অপরটার অনুমান হবে। তৃতীয় ক্ষেত্রে, তা হয় না। সেখানে ক দিয়ে (ব্যাপ্য) খ'এর অনুমান ঠিক হবে, কিন্তু খ দিয়ে (ব্যাপক) ক'এর অনুমান ঠিক হবে না। ধোঁয়া দেখে আগুন আছে ভাবা চল্‌বে, কিন্তু আগুন দেখে ধোঁয়া আছেই ভাবা চল্‌বে না। আগে যে লক্ষণ দিয়েছি, তাতেই বাধে। আগুন—হেতু, ধোঁয়া=সাধ্য যদি হয়, তাহলে দেখি, আগুনের অধিকরণ বা ক্ষেত্রে যে অভাব বা না-থাকা তার প্রতিযোগী বা বিষয়ীভূত ধোঁয়া হতে পারে; সাদা কথায়, যেখানে আগুন আছে, সেখানে ধোঁয়া না থাক্‌লেও থাকতে পারে; কিন্তু লক্ষণমত, তার অপ্রতিযোগী হওয়া দরকার, কি না, আগুনের অধিকরণে ধোঁয়ার অভাব হবে না।

আমরা লৌকিক সন্নিকর্ষ কয়টার নাম দিতে যাইয়া প্রসঙ্গক্রমে সম্বন্ধ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিলাম। সম্বন্ধবাদই নৈয়ায়িকদের চিন্তাসৌধের বুনিয়াদ। সন্নিকর্ষ কয়টা বোঝার জন্য "সমবায়" সম্বন্ধ বোঝা দরকার। সমবায় বৈশেষিকের সাতটা পদার্থের

একটা। সমবায় বলিতে একপ্রকার নিত্য সম্বন্ধ বোঝায়। সাবয়ব দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ—এরা সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে। সংযোগ সম্বন্ধটা কেবল দ্রব্যের মধ্যেই হয়। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করি—জলের দ্রবত্ব কোন্ সম্বন্ধে জলে আছে?—তা হইলে সংযোগ বলিলে চলে কি? তাদাত্ম্য বলিলে চলে কি? আধার-আধেয় বলিলেও (ভাঁড়ে যেমনধারা দই থাকে) হয় কি? বহ্নির উষ্ণতা বা জলের দ্রবত্ব একটা আলাদা রকমের সম্বন্ধ। আর বেশী তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিব না, তবে, আশা করি, এই নমুনা থেকেই মোটামুটি একটা ধারণা করিতে পারিলাম। এখন, সংযোগ-সন্নিকর্ষ দ্বারা ঘট এই দ্রব্যটাকে জানি; সংযুক্ত-সমবায় দ্বারা জানি ঘটত্ব এই জাতি, আর তার গুণ, কর্ম। ঘটের রূপটা এই সম্বন্ধ দ্বারা জানি। সে রূপেরও একটা জাতি আছে—রূপত্ব। সেটা জানিতে সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সম্বন্ধের দরকার হয়। শব্দকে জানি সমবায়-সন্নিকর্ষ সম্বন্ধ দ্বারা। কথাগুলো পরিষ্কার করার চেষ্টা কর্‌লাম না। ভাষাপরিচ্ছেদ প্রভৃতি যে কোনো ন্যায়ের পুঁথিতে এদের বিবৃতি ও ব্যাখ্যা মিল্‌বে।

অনুমানের আসল কথা আগেই বলেছি। ন্যায়ে অনুমিতি হইয়া থাকে এই ভাবে—রান্নাঘরে বা অন্যত্র ধূমের সঙ্গে বহ্নির সামানাধিকরণ্য বা সহচার আমি দেখ্‌লাম—ধূম আছে সেই সঙ্গে বহ্নিও আছে, এই ভাবে। তাতে ক'রে, ধূম আর বহ্নির ভেতর একটা ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধের ধারণা হয়—ঐটে ব্যাপ্তি জ্ঞান। সময়ান্তরে পর্বতে ধূম দেখলে ঐ ব্যাপ্তির কথা মনে হয়—ধূম যখন আছে, তখন বহ্নি থাক্‌বেই, এই নিয়মটি মনে হয়। পর্বতে বহ্নির অনুমানে এই ব্যাপ্তি জ্ঞানটা করণ অর্থাৎ ব্যাপারের জনক। তারপর, পর্বতটায় বহ্নির ব্যাপ্য (কি না, যেটা থাক্‌লে বহ্নি থাক্‌বেই) ধূম রয়েছে—জ্ঞানটা এই আকারে দাঁড়ায়। পর্বতে বহ্নি আছে কি না আছে এই সংশয় আছে, এইজন্য পর্বত হল পক্ষ (সন্দিগ্ধ-সাধ্যবত্বং

অথবা সিষাধয়িষাবিরহ-বিশিষ্ট-সিদ্ধ্যভাবঃ)। কাজেই, জ্ঞানটা যখন এই আকারে দাঁড়াল—তখন আমার ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পক্ষধর্মতার (বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবানয়ং পর্বতঃ) জ্ঞান হল। এইটে পরামর্শ (তৃতীয়-লিঙ্গ-পরামর্শ) বলা হয়। এইটে হল অনুমিতির ব্যাপার। তারপর পর্বতে বহ্নি আছে এই অনুমিতি হল। নিজের জন্য অনুমিতি স্বার্থ, আর অপরকে বোঝাইবার জন্য অনুমিতি (যাতে তার সকল অবয়ব ভাঙ্গিয়া দেখান হয়) পরার্থ। পরার্থ অনুমিতিতে পাঁচটা অবয়ব থাকে—প্রতিজ্ঞা—এটি বহ্নিমান্। হেতু—কেননা ধূম রহিয়াছে। যেথা যেথা ধূম, সেথা সেথা বহ্নি, যেমন, মহানস—উদাহরণ। এটি দেখছি বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্—উপনয়। সুতরাং এটি বহ্নিমান্—নিগমন। এটাকে পাশ্চাত্য লজিকের syllogism বলা যাবে না।

আগে তিন অনুমানের নাম দেওয়া হত—পূর্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতো দৃষ্ট (মহর্ষি গৌতম প্রথমাধ্যায়ে তাই দিয়াছেন)। নবীন লেখকেরা বলেন—কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী, অন্বয়-ব্যতিরেকী। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ একস্থলে বলিয়াছেন—পূর্ববৎ পূর্ব-কালীন সাধ্যানুমাপক, শেষবৎ উত্তরকালীন সাধ্যানুমাপক, আর সামন্যেতোদৃষ্ট বিদ্যমান সাধ্যের অনুমাপক। প্রথমাধ্যায়ে অনুমান-সূত্রের উপর তাৎপর্যটীকা প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য। "সামান্যতোদৃষ্ট" বুঝাইতে তাৎপর্যটীকা বলিছেন—সামান্যেনাবিনাভাবিনা হেতুনা লক্ষিতং দৃষ্টং ধর্মিরূপমনুমানং সামান্যতোদৃষ্টমনুমানম্। যেখানে সাধ্যের ব্যতিরেক (negation) কোথাও নেই—যেখানে সাধ্য না থাকার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না বা নাই—সেখানে কেবলা-ন্বয়ী, যেমন, ঘটটা অভিধেয়, বাচ্য, যেহেতু, এটা প্রমেয়—এক্ষেত্রে, অভিধেয় বা বাচ্য নয় এমন কিছু নেই। ব্যতিরেক উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না; এমন বলা যায় না—এই দেখ, এটা অভিধেয় নয়, অথচ এতে প্রমেয়ত্ব আছে বা নেই। Negative instances দেওয়া যায় না। আর যেখানে শুধু negative instances দেওয়া

যায়, যেখানে পক্ষেই সাধ্য আছে, অতিরিক্ত স্থলে নাই (that is unique), সেখানে কেবলব্যতিরেকী। যেমন, পৃথিবী আর সব দ্রব্য হ'তে আলাদা, যেহেতু এতে পৃথিবীত্ব বা গন্ধবত্ত্ব রয়েছে। এখানে পৃথিবী ছাড়া (যেটা এখানে পক্ষ) আর কোথাও পৃথিবীত্ব নেই। অন্বয়-ব্যতিরেকীতে সাধ্য আর সাধ্যাভাব দুয়েরই অন্যত্র প্রসিদ্ধি থাকে, কাজেই positive and negative দুরকমেরই instance পাওয়া যেতে পারে। যেমন, সেই পর্বত আর বহ্নির অনুমানে। ব্যতিরেকব্যাপ্তির জ্ঞান না হয়ে, কেবল অন্বয়ব্যাপ্তির জ্ঞান থাক্‌লে যে অনুমান হয়, তাই কেবলান্বয়ী। আর, অন্বয়ব্যাপ্তির জ্ঞান হয় না, কেবল ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞানের দরুণ যে অনুমান, তাই কেবলব্যতিরেকী। আর দুই রকমেরই ব্যাপ্তিজ্ঞান হ'তে যে অনুমান হয়, তাই অন্বয়-ব্যতিরেকী। ভাষাপরিচ্ছেদ (৬৯) অন্বয়ব্যাপ্তি, আর (১৪৩) ব্যতিরেকব্যাপ্তির লক্ষণ দিয়েছেন। আমরা অন্বয়-ব্যাপ্তিটা আগেই বুঝতে চেয়েছি। ব্যতিরেকব্যাপ্তি হচ্ছে—"সাধ্যা-ভাবব্যাপকত্বং হেত্বভাবস্য যদ্‌ভবেৎ"। পুকুরে ধোঁয়া নেই (এই absence বা negation টা) যেখানে সাধতে হবে, সেখানে এই রকম ব্যতিরেকব্যাপ্তি ভাব্‌তে হয়। আগুন নেই, কাজেই ধোঁয়া নেই—এই হেতু দেখতে হবে। এখানে দেখছি—হেতুর, কিনা, আগুনের অভাব হচ্ছে ব্যাপক, আর সাধ্য, কিনা, ধোঁয়ার অভাব হচ্ছে ব্যাপ্য। যেটা ব্যেপে থাকে সেইটে ব্যাপক, যেটাকে ব্যেপে থাকে সেইটে ব্যাপ্য। সেই বৃত্ত এঁকে বুঝতে সুবিধে হবে। আগুনের অভাব হলে ধোঁয়ার অভাব হবেই, কিন্তু ধোঁয়ার অভাব হ'লে আগুনের অভাব না হতেও পারে—নির্ধূম আগুন থাক্‌তে পারে। "পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ"—এখানে কিন্তু বহ্নি ব্যাপক এবং সেইটে সাধ্য ; আর ধূম হেতু, সেইটে ব্যাপ্য। ব্যতিরেকের বেলায় ব্যাপ্য-ব্যাপকটা উল্‌টিয়ে যায়।

পূর্ববৎ অনুমান—কারণহেতুক। যেমন খুব মেঘ হয়েছে দেখে

বা কঠিন রোগ হয়েছে দেখে, বৃষ্টি বা মৃত্যুর অনুমান। শেষবৎ কার্যহেতুক। যেমন, সকালে উঠে নদী নালা সব জলে ভরে রয়েছে দেখে, মাটি স্যাৎ স্যাৎ কর্‌ছে দেখে, অনুমান করলাম রাত্তিরে বৃষ্টি হয়েছিল (যদিও ঘুমিয়ে থাকার দরুণ আমি জানতে পারিনি)। ধোঁয়া দেখে আগুনের অনুমানও এই কোঠায় পড়ে। আর, এ দুরকমের কোনও রকমের নয় হল—সামান্যতো-দৃষ্ট। যেমন, দিনের পর রাত হবে, জন্মেছি যখন মর্‌তে হবে; জানোয়ারটার যখন শিঙ রয়েছে, তখন ল্যাজও আছে। এ সব ক্ষেত্রে, দিন রাতের কার্য বা কারণ না; জন্ম যে মরণের কার্য বা কারণ তাও বুঝি না, শিঙ থাক্‌লে যে কেন ল্যাজ থাকবে, তাও বুঝি না।

কেবলান্বয়ীটা পূর্ববৎ, কেবল-ব্যতিরেকটা শেষবৎ, আর অন্বয়-ব্যতিরেকীটা সামান্যতোদৃষ্ট—এই ভাবে মিলাইয়া দেবার চেষ্টা নব্যেরা করিয়াছেন। যাক, সে কথা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। পক্ষ, সপক্ষ প্রভৃতি কয়টি কথাও বোঝা দরকার। যেখানে সাধ্য আছে কিনা এই সন্দেহ থাকে, সেইটা পক্ষ। যেখানে সাধ্যের নিশ্চয় থাকে, সেটা সপক্ষ। যেখানে সাধ্য নেই এই নিশ্চয় থাকে, সেটা বিপক্ষ। আর, পক্ষে যেখানে সাধ্যটি পাইব মনে করিতেছি, সেখানে যদি সাধ্য না থাকে, তা হইলে বলা হয়, সেখানে বাধ বা বাধা আছে। সাধ্য থাকার যেমন হেতু দিতেছি, তেমনি যদি না থাকারও হেতু থাকে, তবে বলা হয় প্রতি-পক্ষ আছে, অর্থাৎ, সেস্থলে সৎপ্রতিপক্ষ (স্বসাধ্যবিরুদ্ধ-সাধ্যা-ভাব ব্যাপ্যবত্তা পরামর্শকালীন-সাধ্যব্যাপ্যবত্তা-পরামর্শ-বিষয়ঃ) হইল। এখন, বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে—অনুমানে যে হেতু আমরা দেখাই, তাতে কতকগুলি ধর্ম (criteria) থাকা আবশ্যক। অন্বয়ব্যতিরেকীটাই সচরাচর হইয়া থাকে। তার হেতুতে ছয়টা ধর্ম থাকা চাই। থাকিলে সেটা নিরুপাধি-অনুমান হবে। নইলে সোপাধিক বা উপাধিবিশিষ্ট হবে (উপাধি যে দোষ বা fallacyর

কারণ, তা আমরা আগেই বলিয়াছি)। সে ছয়টা ধর্ম্ম হইতেছে—পক্ষবৃত্তিত্ব (পক্ষে থাকা চাই, যেমন পর্বতে ধূম্); সপক্ষসত্ব (সপক্ষে থাকা চাই, যেমন মহানস, গোষ্ঠ ইত্যাদিতে); বিপক্ষব্যাবৃত্তত্ব (বিপক্ষে, কিনা, জলহ্রদাদিতে থাকিবে না); অবাধিতত্ব (কোনরূপে তার বাধ বা বাধা হবে না, যার দরুণ হয়ত সেটি থাকা সত্ত্বেও সাধ্য থাকিল না; যেমন আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে—যদু আগুনে হাত দিল, তার হাত পোড়া উচিত, কিন্তু পুড়িল না; সে হয়ত হাতে এমন কোন জিনিস মেখেছে, যাতে তার হাত পুড়িতে দিল না); অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব (কিনা, হেতুর প্রতিপক্ষ, প্রতিবাদী, পাল্টা হেতু, যাতে করে সে ক্ষেত্রে সাধ্যের অনুমান করা যাবে না, এমন হেতু থাকিলে হবে না। হাকিমের কাছে, কোন এক জমিতে আমার সত্ব আছে কিনা বিচার হচ্ছে। একজন সাক্ষী বল্‌ল—হাঁ, ও জমি ওরই বটে। আর একজন সাক্ষীও তামা তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে বলল—না, জমি ওর নয়, অমুকের। এক্ষেত্রে বাদী হেতু, প্রতিবাদী হেতু দুই-ই হাজির। কাজেই সত্য নির্ণয় করা মুস্কিল হ'য়ে পড়ে)। কেবলান্বয়ীতে বিপক্ষ নেই, কাজেই বিপক্ষব্যাবৃত্তত্ব নেই। কেবল-ব্যতিরেকীতে সপক্ষ নেই, কাজেই সপক্ষসত্ব নেই। যাই হোক, আমরা ভাল অনুমান হবার সর্তগুলো দেখলাম। কার্যক্ষেত্রে সর্তগুলো ঠিক বাঁচিয়ে চলতে পারা গিয়েছে কিনা, তা মোটামুটি ঠিক করা যায় বটে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে, নিঃশেষ করে ঠিক করা যায় না। হেত্বাভাস, উপাধি প্রভৃতির জন্যে ফাঁক যে কোথায় আছে না আছে, তা এক সর্বদর্শী চক্ষু ছাড়া কেউ নিঃসংশয়ে ধর্‌তে পারে না। তবে, ব্যবহারক্ষেত্রে যাতে কাজ চলে, তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। অনুমানাদির আর তার আনুষঙ্গিক ব্যাপ্তি, উপাধি প্রভৃতির কড়াকড় লক্ষণ দেবার খুব চেষ্টা হয়েছে। লক্ষণ হিসাবে নির্দোষ বলাও হয়ত যেতে পারে। কিন্তু কোনও এক ক্ষেত্রে লক্ষণ ঠিক ঠিক গেল কিনা, তা এই বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা-পরীক্ষাদির

দিনে জোর করে বলা বড় শক্ত। তা ছাড়া যোগজ প্রত্যক্ষও আছে। এইজন্যে, অনুমানাদি প্রমাণ আর তাদের লক্ষণ নিয়ে বেশী গোঁড়ামি করা ভাল নয়। পূর্বাচার্যেরা সাধারণ জ্ঞানের গণ্ডী ভালমতেই জান্‌তেন, কাজেই গোঁড়ামি কর্‌তেন না। আপ্তপ্রমাণ (reliable expert evidence) আর শ্রুতির পদতলে মাথা নোয়াইবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। কখনও অন্ধ অভিমানের বাতব্যাধি তাঁদের ঘাড় আড়ষ্ট করে রাখে নি। গৌতম সূত্রে (২।১।৩৭)—"রোধোপঘাতসাদৃশ্যেভ্যো ব্যভিচারাদনুমানমপ্রমাণম্" —এইরূপে আপত্তি তুলিয়া তার সমাধান করিয়াছেন। ভাষ্য, বার্তিক, টীকা প্রভৃতিতে বিচার আছে।

উপমিতি আর শাব্দ বলে আর দুরকম প্রমাণ ন্যায় মানেন, বৈশেষিক আলাদা করে মানেন না। শাব্দের সম্বন্ধে দুচার কথা বেদান্তের বক্তৃতায় বল্‌ব। শাব্দ জ্ঞানের করণ হচ্ছে পদের জ্ঞান। পদের অর্থ যদি উপস্থিত থাকে ত, সেইটেই হল ব্যাপার। আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি ও তাৎপর্যজ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে সহকারি কারণ রূপে থাকা চাই। থাকলে শাব্দজ্ঞান হবে। পদ আর তার একটা মানে থাকলেই কিছু হল না। অন্বয় বা context ঠিক থাকা চাই। মানে হতে দেয় না এমন কোনও বাধক থাকবে না—যেমন, জল দিয়ে ছেঁচছে, না বলে যদি বলি, আগুন দিয়ে ছেঁচছে, তা হলে কোন মানে হয় না। যোগ্যতা থাকা চাই। পদগুলোর যোজনা বা অন্বয় একটা নিয়মে হওয়া চাই, যাতে করে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া অধিকরণ ইত্যাদি ঠিক ঠিক ধরতে পারা যায়। পদগুলো উল্টো-পাল্টা হলে, অথবা অযথা ব্যবধান থাকলে, অনেক সময় বাক্যের মানে হয় না। তার পর, কি অভিপ্রায় বা তাৎপর্য নিয়ে বক্তা বল্‌ছে সেটাও জানা চাই। খেতে বসে কেউ বল্‌ল—সৈন্ধব নিয়ে এস। সৈন্ধব মানে ঘোড়াও হয়। এখন, যে শুন্‌ল, সে কি খাবার সময় ঘোড়া ধরে নিয়ে এসে হাজির কর্‌বে? এই শব্দ (নির্দিষ্ট

অর্থবিশিষ্ট হলেও) মাত্রই প্রমাণ নয়। আপ্তবাক্য প্রমাণ। আপ্ত মানে যে ব্যক্তি বাক্যার্থগোচর-যথার্থ-জ্ঞানবান্। পূর্ণ আপ্ত হ'চ্ছেন ঈশ্বর, তাঁর বাক্য বেদ প্রমাণ। শব্দ সম্বন্ধে আরও কিছু মীমাংসা ও বেদান্তের প্রসঙ্গে বলব। শব্দের 'শক্তি' আর 'লক্ষণা' আছে। ঘট বলতে যে ভাঁড় কলসী বোঝাবে আম কাঁঠাল বোঝাবে না, তার কারণ নৈয়ায়িক মতে ঈশ্বরের অনাদি ইচ্ছা—তাঁর ইচ্ছাতেই কোন একটা পদ কোনও এক নির্দিষ্ট মানে বোঝানোর শক্তি ধরে। এটা হেসে ওড়ানর কথা নয়। তা আমরা অন্যত্র দেখবো। যেখানে একটা পদ তার সাক্ষাৎ মানেটা না বুঝিয়ে পরম্পরা সম্বন্ধে আর একটা মানে বোঝায়, সেখানে লক্ষণা হয়। যেমন, তিনি গঙ্গাবাস কর্‌ছেন। তার মানে গঙ্গার জলে নয়, গঙ্গার তটে বা নিকটে। ন্যায়সূত্রে দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় আহ্নিকে ৫৮ প্রভৃতি সূত্রে পদ, পদের বাচ্য (ব্যক্তি, আকৃতি, জাতি এই সব) নিয়ে আলোচনা আছে। নব্যেরা এ সব নিয়ে চুলচেরা বিচার ক'রেছেন। গদাধরের শক্তিবাদ, জগদীশের শব্দ-শক্তি-প্রকাশিকা—এ সব সূক্ষ্ম বিচারের বই।

উপমিতিটা সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্য দেখে হয়।—এক রকম বুনো গরুকে গবয় বলে। আমি দেখিনি। বুনো একজন এসে বললে—বনে গবয় ব'লে—গোরুর মতন এক রকম জানোয়ার আছে। আমি একদিন বনে গিয়ে গবয় দেখলাম। গবয় আর গরুর সাদৃশ্যটা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল—গরুর মতন দেখতে গবয় শুনেছিলাম; এ জানোয়ারটা ত' দেখতে গরুর মতই বটে, অথচ ঠিক গরু নয়; কাজেই, গবয় নাম এর—গবয় পদের বাচ্য এটা। বৈধর্ম্য বা বৈসাদৃশ্য দেখেও উপমিতি ন্যায় মানেন। এই উপমিতি দ্বারা সংজ্ঞা আর সংজ্ঞীর—বাচক ও বাচ্যের—সম্বন্ধ জ্ঞান হয়ে থাকে। অনেক জিনিসের নাম আমরা শুনেছি। হয়ত আজও দেখিনি। আমাদের দেখা জিনিসের সঙ্গে তাদের মিল বা অমিলের কথাও শুনেছি। পরে

কোন সময়, সেই রকম একটা জিনিস দেখলে মনে হয়—ও, রিকশা নামটা শুনেছিলাম, একেই বলে রিকশা। ডিমসন্দেশের নাম শুনেছিলাম, একেই বলে ডিমসন্দেশ; ইত্যাদি। হামেশাই এইরকম ধারা analogy আর তার বিপরীত ধরে, কোথায় কোন্ শোনা নামটা দেওয়া যাবে না যাবে, তা ঠিক করে নিতে হয়। বৈশেষিক এটাকে প্রত্যক্ষ অনুমান এ দুয়ের বাহিরে ফেলবেন না। সাংখ্যও এটাকে আলাদা একটা কিছু ব'লে মানেন না। তবে, জ্ঞানের উপায় হিসাবে এটাও যে খুব দরকারী, তাতে সন্দেহ নেই। ন্যায়সূত্রে উপমিতি সম্বন্ধে আলোচনা ২।১।৫৭ প্রভৃতিতে আছে।

ন্যায়শাস্ত্র প্রমাণেরই শাস্ত্র, তাই প্রমাণ নিয়ে দুদশ কথা আমরা বললাম। ওপর ওপর বললাম। এক বিশাল, দুরূহ শাস্ত্র তৈরি হয়েছে—প্রমাণ নিয়ে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ, সব্বাইএর ওপর টেক্কা দিয়েছেন। পরিভাষাগুলো শক্ত, কিছু গণিত বা বিজ্ঞানের পরিভাষার মতন, বেশ চাঁছা-ছোলা। চাঁছাই কাজটায় মেহনৎ আছে, কিন্তু দরকারী। গণিতে বা বিজ্ঞানে যেমন। ভড়কালে চলবে না। প্রমাণের সাগর ত' কোনো গতিকে পাড়ি দিলাম। এখন প্রমেয়ের সাগরে গণ্ডুষ করিয়া উঠিব। ন্যায় মুখ্যত প্রমাণ শাস্ত্র বটে, কিন্তু প্রমেয় প্রসঙ্গটাকেও যেন কেউ গোষ্পদ মনে না করেন। যেমন কার্য-কারণ সম্বন্ধের বিচার, অভাবের বিচার; এগুলোও বিরাট্। কারণ সোজা কথায়—খ'এর নিয়ত পূর্বে ক আছে (invariable antecedent), অতএব ক খ-এর কারণ, এ বল্‌লে হয় না; তা হলে দিন রাত্রির বা রাত্রি দিনের কারণ হয়ে পড়ে। "অন্যথাসিদ্ধিশূন্যতা" হওয়া দরকার। অন্যথাসিদ্ধি অনেক রকমের। Antecedentটা কেবল invariable হলে হল না; সেই মিলের ভাষায় unconditional হওয়াও চাই। দিন হলেই রাত হবে বটে, কিন্তু যদি পৃথিবী যেমনধারা পাক খাচ্ছে, সেই

রকমধারা পাক খেতেই থাকে, তবেই। পাক খাওয়া বন্ধ হলে হবে না। ইংরাজি লজিকে যাকে method of difference বলে, প্রধানত, তাই দিয়ে ক-খকে কার্যকারণ সম্পর্কে বাঁধ্‌তে হবে। যেখানে যেখানে খ দেখা গিয়েছে, তার আগে ক'কে দেখা গিয়েছে; কিন্তু আর সবই আছে, মাত্র ক নেই, এমন হলে খ হল না। ক'টি অবশ্যই চাই; ক ছাড়া গ ঘ এসব অবান্তর। কারণ-সামগ্রীতে (total assemblage of conditions) গ, ঘ এ সব টেনে আনা ঠিক নয়। যার কাজ তার খোঁজ হয়ত নেই, বাজে লোক ধরে টানাটানি! টেনে আনলে ঐ অন্যথাসিদ্ধির মামলায় পড়ে গেলাম —"অবশ্যকলৃপ্ত-নিয়তপূর্ববর্তিন এব কার্যসম্ভবে তদ্‌ভিন্নত্বং অন্যথা-সিদ্ধিঃ।"ঘট তৈরি কর্ত্তে ছানা মাটি, দণ্ড চাকা, কপাল ছুটোকে যোড়া দেওয়া, কুমোর, কুমারের ইচ্ছা যত্ন—এসব অবশ্য-কলৃপ্ত, আর ঘট তৈরি হবার আগে এগুলো থাকেই; এগুলো থাক্‌লেই ঘট সম্ভব হয়ে থাকে; আর কিছুর দরকার হয় না—আর কিছু necessary নয়। যেমন, কুমোরের গাধাটা, বাবা, বউ ইত্যাদি। এ সব অনাবশ্যক বাদসাদ দিয়ে কারণসামগ্রী নির্দেশ কর্‌তে হয়। আবশ্যক কি কি তা ঠিক করা কার্যক্ষেত্রে শক্ত। এদেশে যতদূর পারা যায় শুদ্ধ লক্ষণ বাছাই করার চেষ্টা হয়েছে। ও দেশের লজিকে (এবং বিজ্ঞানাগারগুলিতে)—Methods of Agreement, Difference, Joint Agreement and Difference, Concommitant Variation, Residue—প্রাচীন এবং নবীন নানান্ সংস্করণে আলোচিত হয়েছে। আমাদের তর্কের চতুষ্পাঠীতে সেগুলো আলোচ্য হওয়া দরকার। কারণ সাধারণ, অসাধারণ। কার্যমাত্রের জন্যই যে যে কারণ আবশ্যক (কার্যত্বাবচ্ছিন্নকার্যতা-নিরূপিতকারণতা), সেগুলো সাধারণ কারণ। ন্যায়মতে—ঈশ্বর, ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি বা যত্ন, দিক্, কাল, অদৃষ্ট, প্রাগভাব (হবার আগে কার্যটির না-থাকা)—এই আটটি; কেউ বা, এর সঙ্গে

প্রতিবন্ধক না থাকাটাও বলেন। কার্য হলেই তার মূলে এ কয়টি থাকবেই।

অন্য রকমে কারণকে তিন রকম বলা হয়—সমবায়ি, অসমবায়ি, নিমিত্ত। অন্য অন্য দর্শনে উপাদান আর নিমিত্ত। যাতে সমবায় সম্বন্ধে থেকে কার্যটি হয়, তাকে সমবায়ি কারণ বলে। ঘটের বেলাতে মাটি দিয়ে তৈরি কপাল; পটের বেলা সুতো। নিজে সমবায়ি কারণে থেকে যেটা কার্যের জনক হয়, সেটা অসমবায়ি কারণ। যেমন, কপাল দুটোর যে সংযোগ, সুতোগুলোর যে সংযোগ বা বিন্যাস ঘট-পটের অসমবায়িকারণ; কপালের রং ইত্যাদি, সুতোগুলোর রং ইত্যাদি—ঘটে পটে অসমবায়িকারণ হ'য়ে রং জন্মিয়েছে। যাঁরা সূক্ষ্ম করে বুঝ্‌তে চান তাঁরা "সমবায়-স্বসমবায়িসমবায়ান্যতরসম্বন্ধেন সমবায়িকারণে প্রত্যাসন্নত্বে সতি জ্ঞানাদিভিন্নত্বে সতি কারণং" এই রকমের লক্ষণ পরীক্ষা করে বুঝ্‌তে চেষ্টা করুন। সূক্ষ্ম দূরেই থাকুন, আমরা স্থূলেই "দণ্ডবৎ" করেই এখন ফির্‌ছি। এ দুরকম কারণ ছাড়া যে কারণ, তাই নিমিত্ত। যেটা কার্যের উপাদান দ্রব্য নয়, অথবা সেই দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে রয়েছে এমন একটা কিছু নয়, যেটা যেন কতকটা "বাইরে থেকে" (কার্যের "তটস্থ" হয়ে) কার্যটিকে তৈরি করে, সেইটা নিমিত্ত—যেমন, ঘটের বেলা কুমোরের চাকা, ঘুরোনর লাঠিটা, কুমোরের ইচ্ছে, যত্ন ইত্যাদি।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে কার্যটা জন্মানর আগে কারণকূটের মধ্যেই কোন না কোন ভাবে থাকে না (যেমন, বট গাছটা অব্যক্ত ভাবে তার বীজে থাকে মনে করা যেতে পারে)। একে কার্যের প্রাগ-ভাব বলে। দুটো পরমাণুর সংযোগ হয়ে দ্ব্যণুক, তিনটে দ্ব্যণুক মিলে ত্রসরেণু ইত্যাদি ক্রমে দুটো কপাল মিলে ঘট জন্মাল; এই রকমধারা সংযোগাদির ফলে কার্যের আরম্ভ হল, যে কার্য আগে হতেই ছিল না। একে আরম্ভবাদ, অসৎকার্য বা কার্যের প্রাগ-

ভাববাদ বলা হয়। সাংখ্য আর বেদান্ত এটা এভাবে মানেন না; এ নিয়ে অনেক লড়েছেন।

পদার্থ বলা হয়েছিল সাত প্রকার—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাব। এ সম্পর্কে দু'টো কথা বলেই শেষ কর্‌ব। অর্থাৎ, ন্যায়-বৈশেষিকের লজিক বাদ দিয়ে যেটা Philosophy এবং Metaphysics, তা নিয়ে এক রকম কিছুই বলা হল না। যাঁরা মোটামুটি বিবরণ পেতে চান, তাঁরা, তর্কসংগ্রহ, তর্কামৃত, তর্ককৌমুদী (লৌগাক্ষিভাস্কর কৃত), ভাষাপরিচ্ছেদ, লক্ষণাবলী (উদয়নের) ইত্যাদি পুঁথি উল্টে দেখ্‌বেন। ন্যায়-বৈশেষিকের Physics, Psychology এবং Metaphysics বিশেষভাবেই আলোচ্য। হালের বিদ্যার সঙ্গে তুলনা করার অনেক জিনিস আছে। অনেক অভিনব আলোকরশ্মি তা হতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে দেখ্‌ব। আমরা এখানে দ্রব্য নিয়েই দুটো একটা কথা বল্‌ছি। গুণ, কর্ম প্রভৃতির আলোচনার জন্যে ঐ সব পুঁথির কাছে, তাদের আকর শাস্ত্রগুলির কাছে, অথবা ন্যায়ের টোলে বায়েনা দিয়ে ছুটি নিচ্ছি।

দ্রব্য—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ মরুৎ, ব্যোম, দিক্, কাল, মন, আত্মা—এই কয়টা। আলাদা আলাদা। প্রথম চারটের পরমাণু আছে, আর পরমাণু দিয়েই তারা তৈরি। মনটাও অণু, কিনা, সূক্ষ্ম বস্তু। ব্যোম বা আকাশ শূন্য নয়—শব্দের আশ্রয় ব্যাপক (বিভু) দ্রব্য। ঈথার নয়, কিন্তু ঐ ঈথারের মতনই একটা নিত্য, সর্বব্যাপী পদার্থ। আত্মা জীবাত্মা আর পরমাত্মা—ঈশ্বর। দিক্ এমন একটা পদার্থ যাতে করে সব জিনিসের "দৈশিক সম্বন্ধ" (all space-relations) হচ্ছে—যাতে করে জগতের পদার্থগুলি পরস্পরের সঙ্গে দৈশিক সম্বন্ধ রেখে রয়েছে (Principle of Universal Co-existence or Configuration)। কাল এমন একটা পদার্থ ("শক্তি" বল্‌ছিনা, ন্যায়ে শক্তি বলে আলাদা পদার্থের অঙ্গীকার নেই), যাতে জগতের সব কিছু, আমাদের জ্ঞানের বাহ্য এবং আন্তর বিষয়ে

(objective realities, subjective experiences), পরস্পরের কালিক সম্বন্ধ (এখন-তখন, আগে-পরে, এই রকমধারা) রেখে চল্ছে। আকাশ Space নয়; দিকটা বরং তাই, কিন্তু শূন্য নয়, অভাবপদার্থ নয়। ব্যবহারের গরজে একই নিত্য দিক্ পদার্থে—কাছে দূরে, পূবে পশ্চিমে ইত্যাদি রকমে নানা ব্যাবহারিক ভেদ হয়ে থাকে। নৈয়ায়িকের দিক্-কালের সঙ্গে বর্তমান বিজ্ঞানের Time-Space-Continuum ধারণাটা তুলনা করার মত। আত্মা জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন, সুখ-দুঃখাদির আশ্রয়—"আমি" রূপে যেটাকে জান্ছি। এটা অবশ্য প্রতিশরীরে আলাদা, কিন্তু শরীরের বাইরে নেই এমন যেন না ভাবি। সব আত্মাই সর্বব্যাপী। আত্মা সগুণ বটে, প্রতি শরীরে আলাদাও বটে, কিন্তু নিত্য, সর্বব্যাপী—এ বলাতে বেদান্তের সিদ্ধান্তে যাবার রাস্তাটা খুলে রাখা হল। এ সব আত্মা ছাড়া, নিত্যজ্ঞানেচ্ছাকৃতিমান্ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বর—মানার জন্যেও ন্যায়-বৈশেষিক বিস্তর যুক্তি দিয়েছেন। গঙ্গেশের ঈশ্বরানুমান, উদয়নের কুসুমাঞ্জলির কথা আগেই বলেছি। মনে রাখ্তে হবে—যা কিছু ঘট্ছে, তার মূলেই ঈশ্বরের নিত্য জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতির অপেক্ষা রয়েছে। এ মত স্বাভাবিকতাবাদ বা নিরীশ্বরতাবাদ বা অজ্ঞেয়তাবাদ (Naturalism, Atheism বা Agnosticism) নয়। এমন কি, 'গো' বল্তে যে গোরুই বুঝছি, তাও, মূলতঃ, ঈশ্বরের ইচ্ছায়।

ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ—এরা নিত্য আর অনিত্য। নিরবয়ব পরমাণুরূপে (as ultimate units) নিত্য; সাবয়ব দ্রব্যরূপে (দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু, ঘটপটাদিরূপে) অনিত্য। বিজ্ঞানও একথা বলে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, ক্ষিতি প্রভৃতি আর বিজ্ঞানের "Element", পরমাণু দ্ব্যণুকাদি আর বিজ্ঞানের atoms-molecules ঠিক এক জিনিস নয়। বিজ্ঞানে আর বৈশেষিকে আলাদা রকম রীতিতে পদার্থ ভাগ করা আর সাজান হয়েছে। ক্ষিতি, অপ্

ইত্যাদি মানে সাধারণ মাটী জলও না। "ক্ষিতি" একটা পরিভাষা বা লক্ষণ, তার লক্ষণ যে কোথা যাবে কোথা যাবে না, তা বেশ করে তলিয়ে বুঝে, সতর্ক হয়ে, ঠিক কর্‌তে হয়।

বৈশেষিক দর্শন দ্বিতীয়াধ্যায়ে পৃথিবী জল ইত্যাদির লক্ষণ দিয়াছেন এবং সে সব লক্ষণের বিচার করিয়াছেন। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শবতী পৃথিবী, রূপ-রস-স্পর্শবত্য আপো দ্রবাঃ স্নিগ্ধাঃ, ইত্যাদি দেখিয়া মনে হইতে পারে বুঝি বা সাধারণ মাটি, জলেরই কথা হইতেছে। কিন্তু তা নিশ্চয়ই নয়। সাধারণ মাটি প্রভৃতিতে আর সবের মিশ্রণ আছে। বেদান্তে যে পঞ্চীকরণের বা ত্রিবৃৎকরণের কথা বলা হয়, সে রকম বলি আর যাই বলি, সাধারণ মাটি, জল প্রভৃতি যে খিচুড়ি জিনিস, তা'ত' দেখিতেছি। গাছপালা, জীবজন্তু, আমাদেরও দেহ ত', যাকে মাটি বলি তা নয়, অথচ তারা পার্থিব —পৃথিবী দিয়েই তৈরি। চোখের বিষয় রূপ—রূপ থাকিলেই যে আমাদের চোখ দেখিবে এমন না, "উদ্ভূতরূপ" হওয়া চাই। যাই হোক্, রূপ একটা অর্থ—sense datum বা sensum। রস আর একটা, গন্ধ আর একটা। এইরকম সব। এগুলি sense-data বা sensa। এখন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এই চারিটা sensa যদি কোন দ্রব্যে একসঙ্গে সমবেত থাকে মনে করি—fourfold complex of sensa—তবে সেই লক্ষণমাফিক ideal দ্রব্যটাই পৃথিবী। আমরা যাকে পৃথিবী বলিয়া ব্যবহার করিতেছি, তাতে অবশ্য এই আদর্শ লক্ষণলক্ষিত পৃথিবীতত্ত্ব আছে। কিন্তু শুদ্ধ অসঙ্কীর্ণ ভাবে নেই। সেই যে আদর্শ পৃথিবী দ্রব্য (প্লেটোর Idea গুলো এই রকম), তার যদি চরমসূক্ষ্ম অংশ ধরি, একটা Point নিই, তবে সেই পয়েন্টটা হইল পৃথিবী পরমাণু, a Point of that fourfold complex of sensa.। Complex মানে সমষ্টিমাত্র যেন না বুঝি। Manifold কথাটাও চলিতেছে। হোয়াইটহেড Pattern কথাটা খুব বলেন। তা হইলে পৃথিবীতত্ত্ব—a four-

valued manifold of sensa। একটা দ্রব্য চরমে একটা দ্রব্য-পয়েণ্টে সমবেত এই manifold। আজকাল বিজ্ঞান একটা Four-dimensional Continuum আর Point-event লইয়া জড়জগতের বিবৃতি দিতে চেষ্টা করিতেছেন। ন্যায়-বৈশেষিকের Continuum কেবল যে দিক্-কাল (Space-Time) এমন নয়। তাতে আরও "dimensions" বা নিরূপক (co-ordinate) আছে। যাই হোক,, Point-event বলিলে বিশ্বের গতি বা কর্মের হিসাব তার দ্বারা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু Point-sensa বলিলে কর্ম আর গুণ এই দুই জড়াইয়া যে অনুভূতির বাস্তব জগৎ (Concrete Existence) তার বিবৃতি মেলা সম্ভব। (Point sensa (পরমাণু) আর তাদের সমাহার পৃথিবী প্রভৃতি তত্ত্ব শুদ্ধ-ভাবে ideal হইলেও real—মনের কল্পিত নয়। এখানেই সাংখ্য-বেদান্তাদির জন্য "ফাঁক" হয়ত দেওয়া রইল। এ পরমাণুর সঙ্গে বিজ্ঞানের (অন্যবিধ) বিশ্লেষণে "প্রাপ্ত" ইলেকট্রণ ইত্যাদি যেন গুলাইয়া না ফেলি! বৈশেষিকের analysis বেশী বস্তুতন্ত্র, নির্ভর-যোগ্য। পৃথিবীর মতন জল, বায়ু, তেজঃ, আকাশ—এরাও একটা আদর্শ অথচ বাস্তব দ্রব্য। পৃথিবী যদি হয় X (a, b, c, d) এই প্যাটার্ণ, জল—Y (p, q, r), তেজঃ—Z(m, n), বায়ু—K (s), আকাশ—A, তা হইলে, যেটাকে আমাদের সাধারণ মাটী বলিয়া অনুভব হইতেছে সেটা—X, Y Z, K, A, এই সব কয়টার (দিক্-কাল প্রভৃতিও প্রকারান্তরে আছে) সমাহার, যে সমাহারে X টাই মুখ্য, আরগুলি গৌণ।

তারপর পরমাণুগুলি নিত্য, কিন্তু তাদের "বিশেষ" আছে। বিশেষ (এ ভাবে—অন্যভাবে, বিশেষ মানে অপরজাতি, species of a genus) মানে বলিয়া বৈশেষিক নাম। নৈয়ায়িকেরা অনেকে এ ভাবে বিশেষ মানেন না। মানিলে বলিতে হয়—পৃথিবীর সব পরমাণুগুলোই ঠিক এক নয়; তারা একজাতি হইলেও তাদের

নিজের নিজের ব্যক্তিত্ব আছে, বিশেষগুণ আছে। নইলে, ঠিক একই রকমের পার্থিব পরমাণুর সংযোগে নানা রকমের পার্থিব দ্রব্য হইল কি করিয়া ?—এই একটা যুক্তি দেওয়া হয়। বৈজ্ঞানিক একই রকম ইলেক্ট্রণ দিয়ে, তাদের সংখ্যা আর বিন্যাসের (Atomic Number) তফাৎ দেখিয়ে, নানা রকমের এটম্ (হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি) ব্যাখ্যা করার যত্ন করিয়াছেন বটে, কিন্তু এটা স্থির যে, ইলেক্ট্রণও চরম দ্রব্য নয়, সাবয়ব, পরিমিত বস্তু। কাজেই, যাই ধরিয়া লইয়া এখন হিসাব দিই না কেন, তারা আসলে বিশেষবিহীন না হওয়াই সম্ভব। অন্য কোন বিশেষ যদি বা নাও থাকে ত', তাদের নিজ নিজ "পজিসনের" (relative position in the cosmic stress-system) দরুণ বিশেষ আছে। চাঁদটা পৃথিবী হ'তে আড়াই লাখ মাইল দূরে না থেকে যদি ন কোটি মাইল দূরে থাক্ত, তবে পৃথিবীর সম্পর্কে আর এক রকমের চাঁদ হত, হয়ত চির অমাবস্যার চাঁদই হত, নয়ত খদ্যোতের মজলিশে জোনাকি হয়ে থাক্ত। পজিসনের দাম আছে—নেই ? আমাদের এক পণ্ডিত মশাইকে সংস্কৃত কম্পোজিসনের ক্লাশ দেবার কথা হলে তিনি হেঁসে বলেছিলেন—আমার পজিসন "কম" কিসে, যে আমার ও "ক্লেশ" থাক্‌বে ?

তারপর মনে রাখ্‌তে হবে, বৈজ্ঞানিক অণুগুলোর সংযোগ-বিয়োগ দিয়ে যৌগিক পদার্থগুলোর যে হিসেব দেন, সেটা তাদের গুণের (রূপ, রস ইত্যাদির) হিসেব নয়—যাকে qualitative explanation বলে, তা নয়। কেন হাইড্রোজেনের দুটো দানা আর অক্সিজেনের এক দানা মিলে জলের রূপ (অভাস্বর-শুক্লরূপতা) বা রস (মধুর) হল, তার কোন হদিশ কেমেষ্ট্রিতে নেই। কেবল, মাপা জোকার হিসাব—quantitative explanation। জল হল দেখ্‌ছি ; জল না হয়ে একটা সাপ ব্যাঙ হলেও কথা ছিল না। বৈশেষিকের analysis অন্য রকমের—আমাদের সত্যিকার (concrete)

অনুভূত বাস্তবের। অবশ্য, analysis করে কতকগুলো "আদর্শ-বাস্তব" তিনি এনে দেন। সাধারণ অক্সিজেন মলিকিউলের (O2) এক গুণ, O3 বা "ওজনের" আর এক গুণ—ওজন খেতে পুরীর সাগর সৈকতে বেড়াতে যাই; কোয়াসার ঠাণ্ডাতেও বেরিয়ে পড়ি। এটম্ ওখানে দুটো, ওখানে তিনটে—এইজন্যেই কি তফাৎ? কেমিষ্ট অক্সিজেনের মলিকিউল আর ওজনের মলিকিউল যে আলাদা রকমের ব্যূহ (configuration), তাও হয়ত বল্‌তে পারেন। আলাদা একটা বন্দোবস্ত যে ভাবেই হোক্ মান্‌তে হয়। আর, এটমে যেয়েই শেষ কর্‌লে ত' হল না। পরমাণু যে Point sensa। তাদের পরস্পরের আলাদা আলাদা একটা কিছু (বিশেষ) থাকা খুবই সম্ভব। সংক্ষেপে কথা পেড়ে রাখ্‌লাম। ভেবে দেখ্‌বেন।

তারপর ভেবে দেখ্‌তে হবে—দুটো পরমাণু থেকে দ্ব্যণুক, তিনটে দ্ব্যণুক থেকে ত্রসরেণু হয়, এর মানে কি? ত্রসরেণুতে এলে নাকি উদ্ভূতরূপ হতে পারে—দেখা যায়। এরই বা মানে কি? তিন দুগুণে ছটা পরমাণু হলেই দেখার মত হয়? ওরকম করে বুঝলে হবে না। পরমাণুর কোনও dimension নেই—মাপ নেই। দুটো পরমাণুর সংযোগ মানে linear dimension এর সৃষ্টি, সূক্ষ্ম লাইন (গণিতের ভাষায় dl) হল। একটা পয়েন্ট থেকে এই রকমধারা তিনেটে সূক্ষ্ম লাইন তিন দিকে গেল, এমন হলে three-dimensional spaceএর একটা সূক্ষ্ম ভাগ (element) পেলাম। তখন সেটা প্রত্যক্ষযোগ্য হতে পারে—যদি সে সূক্ষ্মটি দেখার যোগ্য ইন্দ্রিয়াদি থাকে, তবে। পরমাণু, দ্ব্যণুক অবস্থায় প্রত্যক্ষযোগ্যতাই নেই—তিনটে dimension ছাড়া আমাদের প্রত্যক্ষের ব্যবহার নেই। এ কথাটাও ইঙ্গিতের মতন পড়্‌লাম। ভেবে দেখ্‌বার। ন্যায়-বৈশেষিকের সৃষ্টিতত্ত্বও পরে একটুখানি বল্‌ব। অদৃষ্ট বস্তুটাকে চিন্‌তে হবে।

ন্যায়-বৈশেষিকের মন আর আত্মার কথা কিছু কিছু স্থানান্তরে

পাড়্‌ব। মন অণু আর নিত্য। বিভু আত্মা থেকে সুরু করে খুব সূক্ষ্ম তত্ত্ব পর্যন্ত, সবাইকার সঙ্গে মনের নিজেকে জুড়তে হয়। মনকে অণু বলেছেন, অনেক কারণে। বৈশেষিক তৃতীয়াধ্যায় দ্বিতীয় আহ্নিক, গঙ্গেশের চিন্তামণিতে প্রত্যক্ষ খণ্ডে নবম প্রকরণ ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে আলোচ্য। আত্মার কথাও এখানে বলিব না। তবে, মোক্ষের অবস্থায় আত্মায় দুঃখও যেমন থাকে না, সুখও তেমনি থাকে না, জ্ঞান-ইচ্ছাদিও থাকে না—নৈয়ায়িকেরা এমন বলেন বলে নৈষধকার শ্রীহর্ষ হেঁসে বলেছিলেন—"মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে মহামুনিঃ"—মুক্তি হ'লে শিলার মতন হয়ে যাবে। কিন্তু এটা ওপরের কথা—তলিয়ে দেখ্‌লে বেদান্তাদির সম্মত যে মুক্তি, তাই যে অভিপ্রেত, তাতে সন্দেহ নেই। যেন "পাথর হবে" এই ভয় দেখিয়ে বলা হচ্ছে—আত্মাকে ও-রকমধারা অনিত্য গুণবিশিষ্ট ক'রে দেখা "কাঁচা দেখা"। "পাকা দেখার" জন্য প্রস্তুত হও—দেখবে আত্মা সকল নিত্যানিত্য গুণাশ্রয় হয়েও গুণাতীত। বিভু ত' বলেই রেখেছি। আত্মাকে গুণের গুণ দিয়ে বাঁধা যায় না, অথচ সব গুণই তাতে। শেষকালে পাথর হবার ভয়েই প্রথম প্রস্থান ছাড়িয়ে উঠতে হবে। ন্যায় ঈশ্বর মানে, ধর্মও মানে। পথ ঠিকই ধরিয়ে দেয়।

তৃতীয় অধ্যায়

সাংখ্য-পাতঞ্জল

যে জগতে আমরা রয়েছি, তাতে একভাবে দেখ্তে গেলে, ছুটো দিক্ দেখতে পাই—বড়, তার চাইতে বড়, আরও বড় এই রকম-ধারা একটা দিক্। আর, ছোট, তার চাইতে ছোট, আরও ছোট এই আর একটা দিক্। একটা হ'ল মহত্তের দিক্, আর একটা হ'ল অণু বা সূক্ষ্মের দিক্। এই ছু মুড়োর কোনো মুড়োরই শেষ বা অবধি খুঁজে পাই না। তবে ভেবে নিতে পারি—যার পর নাই বড় (পরম মহান্) কিছু হয়ত আছে। আবার যার পর নাই ছোটও (পরম সূক্ষ্ম বা অণু) কিছু আছে। কন্‌টিনুয়াম্ আর পয়েণ্ট—এই ছুই দিক্ দিয়ে ছাড়া জগৎটাকে আমরা দেখতে পারি কৈ? জগৎটাকে ভেঙ্গে চুরে দেখতে গেলে, এই ছুই দিক্ দিয়েই ভেঙ্গে দেখতে হয়—সব চাইতে বড়, ব্যাপক কি বা কারা? আর সব চাইতে ছোট বা সূক্ষ্ম কি বা কারা?

ন্যায়-বৈশেষিক আকাশ, দিক্, কাল, আত্মা (জীবাত্মা ও পরমাত্মা)—এই চারটেকেই যার পর নাই ব্যাপক (বিভু) ব'লে সাব্যস্ত কর্‌লেন; আর, মন এবং চার রকমের পরমাণু-পুঞ্জকে যার পর নাই সূক্ষ্ম (অণু) ব'লে ঠিক কর্‌লেন। কেন এদের ব্যাপক আর সূক্ষ্ম বলেন তার কৈফিয়ৎও তাঁরা দিয়েছেন। কিন্তু সব কৈফিয়ৎ শুনেও মনে প্রশ্ন জাগে—অতগুলো সর্বব্যাপক দ্রব্য না মেনে একটা মান্‌লেই কি কাজ চলে না? এক পরমাত্মা বা ঈশ্বরই পরমমহান্—সর্বব্যাপি তত্ত্ব; আকাশ, দিক্, কাল, জীবাত্মা—এসবই সেই একেরই নানান্ রূপ; এইরকম ক'রে যদি বুঝি, তবে কি বোঝার মামলা অনেকটা সহজ হয়ে যায় না? আর এও মনে হয়

না কি যে, আকাশ প্রভৃতিকে আলাদা ক'রে বল্‌লেও, ঋষিদের এটা অভিপ্রেত যে, যে আরও এগিয়ে ও তলিয়ে যেতে চায়, সে গিয়ে দেখুক্—মূল সর্বব্যাপি তত্ত্ব এক পরমেশ্বরই, আর কিছু নয়? নৈয়ায়িকের ভেতরেই অনেকে (যেমন তার্কিক শিরোমণি) আকাশ প্রভৃতির স্বতন্ত্রতা খণ্ডন ক'রে এক বিভু পরমেশ্বরেই তাদের প্রবিষ্ট ক'রে দিয়েছেন।

মায়াবাদী ছাড়া অনেক বৈদান্তিক সম্প্রদায়েই জীবকে, অণু বা সূক্ষ্ম বলেন; কিন্তু, আমরা দেখেছি, ন্যায়-বৈশেষিক, অন্তরিন্দ্রিয় মনকে সূক্ষ্ম বলেন বটে, কিন্তু জ্ঞান, ইচ্ছা, সুখ-দুঃখাদির আশ্রয় দ্রব্য আত্মাকে ব্যাপকই বলেন। জৈনাদির মতন দেহের তুল্য ব্যাপক ব'লে ক্ষান্ত হন না, সর্বব্যাপক বলেন। অথচ, নানা, অনেক। এতেও কি মনে সন্দেহ হয় না—ব্যবহারের গরজে এবং প্রস্থানোচিত তর্কের খাতিরে, যাই বলা হ'ক না কেন, আসলে, জীবাত্মা স্বরূপে পরমাত্মাই—এইটে বলাই প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়? অবশ্য, জীবে জ্ঞানেচ্ছা সুখ-দুঃখাদি কতিপয় গুণ নিত্য নয়; পরমাত্মায় এর কোনো কোনোটা নিত্য। মোক্ষে জীব পরমাত্মা হবে না, কিন্তু জ্ঞানেচ্ছা সুখ-দুঃখাদিশূন্য "কিম্ভূত কিমাকার" একটা কিছু হবে (শূন্যবাদীর নির্বাণের নক্সাটা কতকটা মনে আসে না কি?)—এ সব ব'লে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের "মুখ" কোনো গতিকে রক্ষে করা হ'য়েছে। কিন্তু স্পষ্টই মনে হয় না কি যে, ভিতরে একটা গভীর ইঙ্গিত আছে, উচ্চতর সোপান অধিরোহণের একটা কৌশল প্রচ্ছন্ন রেখে দেওয়া হ'য়েছে?

অণু বা সূক্ষ্মের দিক দিয়েই, অনেক না মেনে মূলে এক সূক্ষ্ম তত্ত্ব হ'তে আর সব সূক্ষ্মের উদ্ভব বা বিকাশ হ'য়েছে—একথা বল্‌লে কি মামলা অনেকটা সোজা হ'ল মনে হয় না? অবশ্য সাধারণ হিসাবে, বড়র দিক্ দিয়ে, যেমন আকাশ, দিক্ (Space), কাল, আত্মা—এগুলোকে আলাদা পেলেই সুবিধে হয়, সেইরকম, ছোটর

বা সূক্ষ্মের দিক্ দিয়ে, মন আর চার রকমের অসংখ্য পরমাণু (তাদের "বিশেষ" সহিত) পেলেই সুবিধে হয়। কিন্তু যা সব দিয়ে জগতের হিসাব দিচ্ছি, সে সবের নিজেদের হিসাব যখন নিতে যাই, তখন কি মনে হয় না যে, তারা সত্যই আলাদা, স্বতন্ত্র তত্ত্ব না হ'লেও চলে? বরফ, জল আর বাষ্প মূলে এক জিনিস হ'লেও, ব্যবহারে অনেক তফাৎ; কয়লা আর হীরে মূলে একই কার্বণ হ'লেও কাজে ও কদরে তাদের অনেক তফাৎ। এ সব আলাদা আলাদা ধরেই অনেক জিনিস আমাদের বুঝতে হয়। ন্যায়-বৈশেষিকের হিসাব এ ভাবে ঠিকই হ'য়েছে। কিন্তু মূলে দ্রব্যগুলোর, সব কয়টার যদি বা না হয়, অন্ততঃ কোনো কোনোটার, অভেদ থাকতে পারে।

তারপর, স্থূল আর সূক্ষ্ম—বড় আর ছোট—এ দুটোকেও তলিয়ে বোঝবার দরকার আছে। পরমাণু একভাবে চরম সূক্ষ্ম হ'তে পারে বটে, কিন্তু, সেটা যখন একাধিক গুণের আশ্রয়, তার দুটো মিলে যখন সাবয়ব দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়, তখন (শঙ্করাচার্য প্রভৃতি যেমনধারা পরমাণুকারণতাখণ্ডন প্রসঙ্গে ব'লেছেন), সেটা সত্য সত্যই মূল সূক্ষ্মবস্তু না হতে পারে। কেমিষ্ট্রিতে "এটম্" গুলোকে মূল সূক্ষ্ম বস্তু মনে ক'রেই কাজ চল্‌ছে; কিন্তু, সকলেই এখন জানেন যে, এটম্ মূল সূক্ষ্ম বস্তু নয়; এমন কি ইলেকট্রণ প্রোটনও সম্ভবতঃ তা নয়। তাই ধ'রে নিয়ে, হিসেবের সুবিধে হয় ব'লে, ধ'রে নেওয়া হচ্ছে। এই গেল এক দফা। তার পর, মন একরকম সূক্ষ্ম দ্রব্য, পরমাণুও আর একরকম। প্রথম প্রস্থানে বা দৃষ্টিতে, এরা আলাদাই বটে। কিন্তু, মন-অণু আর পরমাণু, এদের একটা অভিন্ন মূল থাকা সম্ভাবিত নয় কি? সেই মূলটাই (সেটা যে কি, তা পরে বল্‌ছি) সত্যিকার চরম বা পরম সূক্ষ্ম (সেই "পয়েণ্ট" তত্ত্ব), যার তুলনায়, মন আর পার্থিবাদি পরমাণু, এ সবই স্থূল—এ রকম হতে পারে না কি? মূর্ত পৃথিব্যাদি ভূতের তুলনায়

এরা খুবই সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু সেই মূলটার তুলনায়, তারা স্থূল। এই রকম আবার, অন্য দিক্ দিয়ে আকাশ, দিক্, কাল—এরা আমাদের সাধারণ ব্যবহারগোচর জিনিসগুলোর তুলনায় খুবই মহৎ এবং ব্যাপক সন্দেহ নাই, কিন্তু আসলে, তারা পরম মহৎ বস্তু না হ'তে পারে। সেই মূল পরম মহৎ বস্তুর (সেটাই বা কি, তা পরে বল্ছি) তুলনায় এরা অব্যাপক, পরিচ্ছিন্ন হ'তে পারে। একটা সোজা কথা ত' সহজেই বুঝ্তে পারি—যদি চারটে পাঁচটা কি দুটোও ব্যাপক বস্তু থাকে, তবে তারা পরস্পরব্যাবর্তক (এটা ওটা নয়, সেটা এটা নয় —এইভাবে) ব'লেও পূর্ণ, অপরিচ্ছিন্ন আর হ'ল না। দিক্ কাল নয়, কাল দিক্ নয়--এই ভাবে, পূর্ণ সত্তার দিক্ দিয়ে, দিক্ কালের দ্বারা, আর কাল দিকের দ্বারা, পরিচ্ছিন্ন হচ্ছে। কোনোটাই সবটা নয়। এইজন্যে, পরম মহৎ বা ব্যাপক বা অসীম একের বেশী বল্তে গেলেই "পরম" কথাটা আর সত্যি সত্যি লাগসই হয় না। ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে ব্রহ্মকেই আকাশ, প্রাণ, ভূমা—এইরকম নানা ভাবে অন্বেষণ করা হ'য়েছে।

যাই হোক্, স্থূল আর সূক্ষ্ম এদের নানান্ স্তর বা গ্রেড্ আছে। একেবারে পরম বা চরম কাকে বা ক'টাকে বল্ব, তা বেশ ক'রে ভেবে দেখ্তে হয়। সোজা সাধারণ হিসাবে যাই বলি না কেন, সূক্ষ্ম ভাবে দেখতে গেলে, সতর্ক হ'তে হয়।—চার পাঁচ একেবারে আলাদা পরম মহান্ অথবা পরম সূক্ষ্ম শেষ পর্যন্ত "ধোপে টিকিবে" কি ? একই মূলের নানা অবস্থা, পরিণাম বা বিকাশ নিয়ে জগতের স্থূল-সূক্ষ্ম, এ দুই দিকেরই হিসাব নিলে সুবিধা হবে না কি ? সত্যিই ত, কোন কিছুর থাকা বা না-থাকা, ঘটা বা না-ঘটা, এ ব্যাপারটাকে অন্য রকমে দেখ্লে ভাল হয় না কি ? ঘটার পূর্বে কোন জিনিস মোটেই থাক্বে না (প্রাগভাব)—এরকম না ভেবে, এমনও ত' ভাবা যায়—কোনও একটা মূলের (প্রধান বা আদি কারণের) ভেতরে সবই সূক্ষ্মভাবে থাকে ; যতক্ষণ সূক্ষ্ম বা অব্যক্তভাবে থাকে,

ততক্ষণ, ব্যবহারে, সেগুলো নেই-ই বটে ; কিন্তু সত্যিকার নেই নয় ; যখন, সেই অব্যক্ত থেকে ফুটে বেরোয়, তখন বলি, সেগুলো আছে বা ঘটেছে ; যখন আবার সেই মূলেই মিলিয়ে যায় (কারণে লয় পায়), তখন বলি, তারা আর নেই, নষ্ট হ'য়ে গেল। হওয়া আর না-হওয়া ব্যাপারটা তা হলে আবির্ভাব আর তিরোভাব। একেবারে যা "অসৎ", কিনা নেই, তা হচ্ছে না ; আর যেটা "সৎ", কিনা আছে, তার একান্তভাবে অভাবও কখন হয় না। একে বলে সৎ-কার্যবাদ। কার্যটা হবার আগে তার কারণে সূক্ষ্ম বা অব্যক্তভাবে থাকে ; তার ফুটে বেরিয়ে আসাই হওয়া। সাংখ্যকারিকা নবম কারিকায় ("অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্বসম্ভবাভাবাৎ। শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্যম্॥") এই ভাবে কার্য যে "সৎ" তা নানা যুক্তি দেখিয়ে বুঝিয়েছেন। বিচারের জন্য বাচস্পতি মিশ্রের তত্ত্বকৌমুদী (পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চুর অনুবাদাদিসহ) প'ড়ে দেখা যেতে পারে। সাংখ্যপ্রবচন সূত্র, ১ম অধ্যায়, ১০৯ হইতে ১২৩ সূত্র পর্যন্ত আলোচ্য। আমরা জগতের একদিকে ক্রম-স্থূল, আর দিকে ক্রমসূক্ষ্ম অবস্থার কথা ব'লেছি—স্থূল ও সূক্ষ্মের একটা ক্রম র'য়েছে। এখন, ক যদি কারণ হয়, খ কার্য হয় ত', খ এর সূক্ষ্ম , অব্যক্ত, অনুদ্ভূত অবস্থাই ক ; আর, ক এর স্থূল, ব্যক্ত, উদ্ভূত রূপই খ। এতে যে সব আপত্তি আস্‌তে পারে, তা সাংখ্যা-চার্যেরা যথাসম্ভব কাটাতে চেষ্টা ক'রেছেন। মোট কথা, এ রকম ক'রে দেখা যে একটুখানি বেশী তলিয়ে দেখা, তা মনে হয় না কি ?

খ'এর কারণ ক, ক'এর কারণও আর কিছু হ'তে পারে ; সেটা ক'এর তুলনায় সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত। এইভাবে ধাপে ধাপে ভিতরে যেতে হয়। শেষকালে প্রশ্ন ওঠে—পরম বা চরম সূক্ষ্ম, অব্যক্ত একটা কিছু নেই কি—যেটা সকলের মূল, অথচ, যেটার নিজের আর মূল নেই ? তারও যদি মূল থাকে ত' অনবস্থা দোষ হ'য়ে পড়্‌ল। জগতের গোড়া খুঁজ্‌তে গিয়ে, কিছু ধরতে গিয়ে, কিছু

ধর্‌তে পারা গেল না—শুধু ঐটে গোড়া—এইভাবে রামধনুর গোড়া ধরবার চেষ্টার মতন ব্যর্থ চেষ্টা করা হ'ল! তাতে জিজ্ঞাসার তৃপ্তি নেই, সুস্থির হবার যো নেই। পক্ষান্তরে যদি একটা মূলকারণ দিয়ে জগৎটাকে বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়, অন্ততঃ তা না মেনে যতটা পারা যায়, মেনে তার চাইতে বেশী ক'রে পারা যায়—তবে, সেই মূলটা চেপে ধরাই ভাল নয় কি? তা হ'লে একটা স্থূল-সূক্ষ্ম, ব্যক্ত-অব্যক্ত, কার্য-কারণ শৃঙ্খলের (সিরিজের) এক মুড়োয় হ'ল আমাদের এই ইন্দ্রিয়গোচর বিচিত্র স্থূলজগৎ, আর, অপর মুড়োয় হ'ল পরম সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, কারণ যেটি, সেটি। মাঝখানে নানান্ ধাপ।

এই স্থূল আর সূক্ষ্ম, ব্যক্ত আর অব্যক্ত হিসেবটাই সত্যিকার হিসেব। বড় আর ছোট, এর তুলনায় একটা কারবারি হিসেব। বীজটাকে বলি ছোট, গাছটাকে বলি বড়। কিন্তু সত্যিই বীজের ভেতরেই অব্যক্তভাবে যদি গাছটা থাকে ত', বীজটা ছোট কিসে? বিজ্ঞানে এটম্ ছোট বটে, কিন্তু তার ভেতরেও ত', ইলেকট্রণ প্রোটনদের একটা জগৎ র'য়েছে। সে জগতে যে বাস করে, তার দৃষ্টিতে এটম্‌টাই একটা জগৎ—ছোট নয়, বড়। ছোট-বড় আপেক্ষিক। এইজন্য, সকলকার গোড়ায় যে মূলটা আমরা চেপে ধর্‌তে চাচ্ছি, সেটাকে বড় (মহৎ পরিমাণ) বলাও ঠিক নয়, আবার ছোট (অণুপরিমাণ) বলাও ঠিক নয়। সেটা এই দুই পরিমাণের কোনটা দিয়েই পরিমিত নয়, অথচ তারই একটা নিজস্ব বন্দোবস্তের ফলে, এই দুই পরিমাণের ভেদ দেখা দিয়েছে। মূল অব্যক্ত বা প্রধানের পরিমাণ নেই—তার ছোট বড় নেই; বেদান্তে ব্রহ্মের যেমনধারা নেই। সেই মূল অব্যক্তের যে প্রথম অভিব্যক্তি, তার প্রথম কার্য বা পরিণাম বা বিকৃতি (primordial manifestation) সেইটে হইল "মহৎতত্ত্ব" —তার পরিমাণ আছে এবং সেটা মহৎ।

অবশ্য, প্রকৃতি বা মূল ("মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্"—৬৭,

সাংখ্যপ্রবচন সূত্র, ১ম অধ্যায়) "পরিচ্ছিন্ন" নয় ; কেন না, তাহা নিখিলের উপাদান (ঐ ৭৪ সূত্র)। নিখিল যেখানে রহিয়াছে, তার উপাদানও নিশ্চয়ই সে স্থানে আছে ; যেমন, যেখানে ঘট বা বস্ত্র, সেখানে অবশ্যই মৃত্তিকা বা সূত্র আছে। এইভাবে—নিজের কার্য বা পরিণাম জগৎপ্রপঞ্চের তরফ হইতে দেখিলে—প্রকৃতি সর্বব্যাপিকা বিভু। "পরিচ্ছিন্ন" বলিতে যে ঠিক কি বুঝিতে হইবে, তা লইয়া বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি বিচার করিয়াছেন। সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই তিন গুণের অতিরিক্ত সামগ্রী ত' প্রকৃতি নয় ; কাজেই ভিতরে এই তিন গুণের পরস্পর পরিচ্ছেদ (স্বগতভেদ) রহিয়াছে। ও-ভাবে পরিচ্ছেদ প্রকৃতির আছে। তা ছাড়া, প্রকৃতি ত পুরুষ নয়, চৈতন্য নয়। কাজেই পুরুষ হইতেও প্রকৃতি পরিচ্ছিন্ন। এইজন্য বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিতেছেন—"পরিচ্ছিন্নত্বমত্র দৈশিকাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদ-কাবচ্ছিন্নত্বং তদভাবশ্চ ব্যাপকত্বম্। তথা চ জগৎকারণত্বস্য দৈশিকা-ভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বমেবেতি প্রকৃতের্ব্যাপকত্বমিতি পর্যব-সিতম্।" ন্যায়ের সেই পরিভাষাগুলো আমাদের মনে আছে ত ? কোনও দেশে না থাকা হ'ল দৈশিকাভাব ; যে কোনও দেশে না থাকে সে দৈশিকাভাবের প্রতিযোগী। প্রকৃতি জগতের কোথাও নেই এমন হ'তে পারে না, কেননা, সেই ত, জগতের চরম সূক্ষ্ম উপাদান। কার্য র'য়েছে অথচ উপাদান নেই, এমনও হয় না। কাজেই প্রকৃতিতে দৈশিকাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব নেই, সে প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্বই আছে। সাংখ্যকারিকাও (৪২) প্রকৃতের্বিভুত্বযোগাৎ ব'লেছেন। কথাটা ঠিক। কার্যরূপ যে জগৎ—যে জগৎ দেশে কালে বিচিত্ররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে—তার সম্পর্ক ধরিয়া দেখিলেই এইরকম পরিচ্ছিন্নতা বা অপরিচ্ছিন্নতার কথা উঠে। যখন দেশ (Space বা Extension)-টাই অব্যক্ত, তখন দৈশিক সম্পর্কের কথা উঠিবে কেমন করিয়া ? মাথা নেই তার মাথা ব্যথা! এইজন্য বল্‌ছিলাম—প্রকৃতি বা অব্যক্তকে অব্যক্তভাবে

দেখিলে—ব্যক্তজগতের সম্পর্ক না ধরিলে—First Cause perse—তাকে পরিমাণের বাইরে রাখাই ভাল। সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে ২য় অধ্যায়ে ১২ সূত্রে দিক্ আর কাল (Space and Time) যে আকাশ আর তার উপাধি ("আকাশাদিভ্যঃ") হইতে হয়, তা বলা হইয়াছে। ভাষ্যে দিক্‌কালকে 'আকাশপ্রকৃতিভূতৌ প্রকৃতের্গুণ-বিশেষৌ' বলা হইয়াছে। এতে এমন যেন না বুঝি যে, আকাশই প্রকৃতি অথবা প্রকৃতিই আকাশ। জগতের একটা মূল অব্যক্ত উৎস এবং উপাদান রহিয়াছে—তা হইতে আকাশ, দিক্, কাল এ সবই নিঃসৃত হইয়াছে, আবার, উল্টাক্রমে, তাতেই সব যাইয়া মিলাইয়া যাইবে। আমাদের দর্শনের আকাশ যে Space নয়, তাও এখানে পাইতেছি।

যাই হোক্, সকল পরিমাণের অতীত অথচ বীজ যে মূল রহস্যটী র'য়েছে, তাকে সাংখ্য অব্যক্ত, প্রধান, প্রকৃতি এই সব নাম দিয়াছেন। অলিঙ্গ, অবিশেষ নামও চল্‌তি আছে। সাংখ্যকারিকার (১০) প্রকৃতি ছাড়া আর সব তত্ত্বকে "হেতুমৎ", অনিত্য, অব্যাপি, সক্রিয় (কিনা, যার পরিস্পন্দন আছে), অনেক, অন্যের আশ্রিত (dependent on others), প্রকৃতি বা মূলকারণের "লিঙ্গ" কিনা অনুমাপক, সাবয়ব বা সংযোগী এবং পরতন্ত্র বলা হ'য়েছে। অব্যক্ত বা প্রকৃতি এ রকমের নয়। কাজেই, এদের বিপরীত যে প্রকৃতি সেটা অলিঙ্গ। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা (সাং, প্র, সূ,১ম/৬১) ব'লে, প্রকৃতিতে বৈষম্য নেই ; প্রকৃতি homogeneous। এইজন্য, এই মানে ধরে, অবিশেষও বলা যেতে পারে। কিন্তু "অবিশেষ" কথাটার বিশেষ মানেও আছে। পাতঞ্জল সূত্রে (সাধন পাদ, ১৯ সূত্রে) বলা হয়েছে, গুণ সকলের বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র আর অলিঙ্গ এই চার রকমের "পর্ব" কিনা অবস্থা আছে। দড়ি তিনটের চারটে যেন গিঁট। অলিঙ্গ প্রকৃতি নিজে। প্রকৃতির যে প্রথম বিকার বা পরিণাম—মহত্তত্ত্ব—সেইটে হ'ল প্রকৃতির লিঙ্গ ; অর্থাৎ সেইটে

নিয়েই প্রকৃতিকে অনুমান কর্‌তে হবে। মহত্তত্ত্বে পৌঁছেই ধরতে পারা যাবে যে—তার পিছনে একটা অব্যক্ত মহারহস্য র'য়েছে। পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন—এই ষোলটাকে শুধুই "বিকার" বলে (সাংখ্যকারিকা, ৩) ; আর এদের প্রকৃতি বা কারণ, অথচ মহত্তত্ত্বের তুলনায় যারা বিকৃতি বা কার্য, সেই অহঙ্কার আর পঞ্চতন্মাত্র—এই ষট্ পদার্থকে "অবিশেষ" বলে। এই একভাবে চারটে গিঁট দেখানো হল। এখানে অবিশেষ কথাটায় মূল প্রকৃতিকে বোঝাচ্ছে না। সাংখ্যকারিকায় (ঐ ৩ শ্লোক) আর একরকম করে গিঁট কয়টা সাজিয়েছেন। কারুর বিকৃতি, পরিণাম বা কার্য নয় এমন যে মূল প্রকৃতি, সেইটে হল প্রথম এবং সকল কার্যেরই উপাদান। তার পর মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আর শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রসতন্মাত্র এবং গন্ধতন্মাত্র—এই সাতটি হল প্রকৃতি-বিকৃতি। তার মানে, তাদের চাইতে সূক্ষ্মের তুলনায় বিকৃতি বা কার্য ; আর নিজেদের চাইতে স্থূলের তুলনায় প্রকৃতি বা উপাদান কারণ। যেমন, মহত্তত্ত্ব মূল প্রকৃতির বিকৃতি, বা উপাদান কারণ। যেমন, মহত্তত্ত্ব মূল প্রকৃতির বিকৃতি, কিন্তু আবার অহঙ্কারের প্রকৃতি ; অহঙ্কার মহত্তত্ত্বের বিকৃতি কিন্তু ঐ পঞ্চ-তন্মাত্রের প্রকৃতি। তারপর, পৃথিবী জল, তেজ, বায়ু, আকাশ—এই স্থূল পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আর মন এই ষোলটা তত্ত্ব (সাংখ্যে পদার্থ না বলে তত্ত্ব বলা হয়) শুধু বিকৃতি বা কার্যই ; এরা অন্য পদার্থ বা তত্ত্বের উপাদান কারণ (প্রকৃতি) নয়। এই-গুলিতে এসে পরিণামপ্রবাহ আর নতুন রকমের তত্ত্ব প্রসব কর্‌ছে না। পঞ্চভূতাদির সংযোগ-বিয়োগে নানা রকমের জিনিস হচ্ছে, আবার নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে বটে (এখনকার কেমিষ্ট্রি প্রভৃতি শাস্ত্র এদের হিসেব দিচ্ছে)। যেমন কার্বণের দানাগুলো এক রকমে সাজানর ফলে হচ্ছে কয়লা, অন্য আর এক রকমের সাজানর ফলে হচ্ছে হীরে, অক্সিজেন হাইড্রোজেন দুটো গ্যাস মিলে হচ্ছে জল ;

ইত্যাদি। এ সমস্ত নতুন নতুন জিনিস বটে, তত্ত্ব নয়। এ সমস্ত পঞ্চভূত ছাড়া আর কিছু নয়। পঞ্চভূত বলতে সাধারণ মাটি, জল, ইত্যাদি যে বুঝতে হবে না, তা আমরা আগের অধ্যায়ে বলেছি। জড় বিজ্ঞান যে সব জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করে, সেগুলো যতই সূক্ষ্মযন্ত্রগ্রাহ্য হ'ক না কেন, আসলে স্থূলই। যেমন, ইলেকট্রণ, এক্সরে, নানাবিধ রেডিয়েসন, ইথার তরঙ্গ ইত্যাদি। আমরা আগের অধ্যায়ে পৃথিবী ইত্যাদিকে যেমন ভাবে বুঝতে চেয়েছি, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, এ সবই পৃথিবী প্রভৃতি স্থূল তত্ত্বেরই সামিল। শুধু আমরা আমাদের সাধারণ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি দ্বারা যে সমস্ত গুণ বা ধর্মের গ্রহণ করিয়া থাকি বা করিতে পারি, তা'দিগকে স্থূল বলিতে হইবে এমন নয়; বৈজ্ঞানিক তাঁর যন্ত্রপাতি সাহায্যেও যা যা গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেগুলিও এখানে আমরা স্থূলের কোঠায় ফেলিতেছি। এটা ঠিক (যেমন ৩৪ এর কারিকার টীকায় বাচস্পতিমিশ্র বলিতেছেন) যে উর্ধ্বস্রোতা যোগীদের শ্রোত্র প্রভৃতি শব্দতন্মাত্রাদিকে বিষয় করিয়া থাকে, আবার স্থূল শব্দাদিকেও বিষয় করিয়া থাকে, আর আমাদের কান কেবল স্থূল শব্দই শুনিয়া থাকে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সাহায্যে যে সব শব্দরূপাদি পাইয়া থাকেন, সে সব, সাধারণ হিসাবে সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু সাংখ্যপাতঞ্জলের পরিভাষা মত সূক্ষ্ম নয়—তন্মাত্র নয়, অবিশেষ নয়।

পাতঞ্জল দর্শন, বিভূতি পাদ, ৪৫ সূত্রে প্রত্যেক ভূতের পাঁচটা অবস্থার কথা বলা হ'য়েছে—স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয়, অর্থবত্ত্ব। তার মধ্যে বিশিষ্ট আকারে যে ইন্দ্রিয়গোচরতা—concrete sense-manifestation or the possibility of such manifestation—তাই হ'ল স্থূল অবস্থা। বিশেষ আকার (particular form) না থাক্‌লে এভাবে গোচরতা হয় কৈ? তা হলে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সাহায্যে আমায় যে রূপ বা শব্দ পেতে দিচ্ছেন, সে রূপ বা শব্দ বিশিষ্টাকার এবং যন্ত্রসহকৃত চক্ষু বা শ্রোত্রের গ্রাহ্য। অতএব,

লক্ষণমত, স্থূল। তার পর, তাদের নানা বিশিষ্ট আকার ছেড়ে দিয়ে, সাধারণ সার ধর্মগুলোর হিসাব নিতে চাইলেই, তাদের "স্বরূপ" ধর্তে পারা যাবে। মাটি, জল ত' হরেক রকমের দেখছি—শুধু চোখেই বল, আর যন্ত্রপাতিতেই বল। কিন্তু এদের সাধারণ সার, আসল ধর্ম কি—যেটা সকল মাটিতে অথবা জলে আছে; যেটা থাক্‌লে মাটি বা জলকে মাটি বা জল বলা যাবে, অন্যথা যাবে না? ইংরাজিতে বল্‌তে গেলে—তাদের differentium কি? ধরা যাক্ (সোজাসুজি) পৃথিবী—কাঠিন্যধর্মী (Principle of Solidity), জল—স্নেহধর্মী (Principle of Liquidity), তেজ—ঔষ্ণ্যধর্মী (Principle of Radiation), বায়ু—প্রেরণাধর্মী (Principle of Mobility), আর আকাশ=সর্বগামিত্বধর্মী (Continuum, or the Principle of pervasive Continuity)। ইন্দ্রিয়গোচর (সাধারণ বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের) জগৎটা বুঝতে এই পাঁচটা দরকার হয় না কি? "পঞ্চ" মানে বিস্তৃত। যেটা খোলা—unfolded, manifest। আচ্ছা, পৃথিবী প্রভৃতির "স্বরূপ" এভাবে পেলাম। তারপর, সূক্ষ্ম। এই সূক্ষ্মটি ধরতে বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতিও ছেড়ে যেতে হবে। যদি সূক্ষ্ম পরমাণু বলি, তা হ'লেও, সেটা যন্ত্রপাতির দৌড়ের বাইরে। আর যদি সূক্ষ্ম মানে তন্মাত্র বলি, তা হ'লেও, বাইরে। তন্মাত্রকেই ভূতসূক্ষ্ম বা ভূতের কারণ বলা হয়।

তন্মাত্র আর অবিশেষ—এ দুটো নামেই বোঝা যাচ্ছে যে, সেটা শুধু তাই; তাতে সেটা বই আর কিছু নেই; আর কিছুর মিশেল নেই; আর তাতে কোনো বিশিষ্ট আকার (particular form) নেই। ধর শব্দ। কাণে যে শব্দ শুনি, তাতে একটা না একটা বিশিষ্ট আকার-প্রকার থাকে। শুধু তাই নয়। হয়ত, কাণে শব্দ শোনার সঙ্গে চোখে রূপ বা চেহারাও দেখছি। পৃথিবী যখন অনুভব হয়, তখন শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচটা মিলে মিশে পাই। (ন্যায়-বৈশেষিকে শব্দ পৃথিবীর নয়)। এই পাঁচটা গুণ বা ধর্ম।

ন্যায়-বৈশেষিক দ্রব্যটাকে (গুণী বা ধর্মীকে] তার গুণের আশ্রয়, অথচ তা থেকে আলাদা বলেন। সাংখ্যে গুণ বা ধর্মগুলোর সমষ্টিই গুণী দ্রব্য ; সমষ্টি থেকে আলাদা একটা কিছু মানার দরকার নেই। যাই হোক্—সাধারণ অনুভবে শব্দাদিকে অনেক সময়ই রূপাদির সঙ্গে সঙ্কীর্ণভাবে পাই, শুদ্ধভাবে, তন্মাত্রভাবে পাই না। যেখানে শুধু শব্দই শুন্‌লাম ভাবি, সেখানেও খেয়াল কর্‌লে দেখা যাবে যে, যার শব্দ তাকে দেখি আর নাই দেখি, অন্যরকমের অনুভূতিও সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে। সেই প্রথম অধ্যায়ের কথাগুলো মনে করুন—সার্চলাইটের দৃষ্টান্ত। অসঙ্কীর্ণ বা খাঁটি ক'রে কোনো এক রকমের অনুভব সচরাচর হয় না। অর্থাৎ তন্মাত্রের অনুভব হয় না। তারপর মিশেলের কথা ছেড়ে দিলেও, শব্দ-রূপাদির অনুভব বিশিষ্ট আকারেই হয় দেখেছি। অবিশেষভাবে হয় না।

তারপর আবার, আমাদের সকল রকম চলিত (সাধারণ ও বিজ্ঞান ব্যবহারে) অনুভবের বিষয়ের উপাদান কি হ'তে পারে ? ন্যায়-বৈশেষিক ব'লেছিলেন—পরমাণুপুঞ্জ। আমরা দেখিয়াছি যে, একটা পার্থিব পরমানু হচ্ছে এমন একটা চরম সূক্ষ্ম (পয়েণ্ট) দ্রব্য, যাতে রূপ, স্পর্শ, রস, গন্ধ এই চারটে ধর্ম সমবেত রয়েছে। এরকমের কল্পনায় গোল বাধে। তার চাইতে বলনা কেন—শব্দমাত্রের (যার সঙ্গে রূপাদি নেই এবং কোনও আকারবিশেষ নেই) একটা চরম সূক্ষ্ম (unit) ভাগ আছে ; রূপমাত্রের আছে ; রসমাত্রের আছে ; ইত্যাদি। অর্থাৎ, fundamentally এগুলো atomic ; আজ কাল বিজ্ঞানে ইলেক্‌ট্রিসিটি যেমনধারা। এখন, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এদের এক একটা "atom" বা "unit" যদি মিলে একটা দানা বাঁধে, তবে সেই দানাটাই হল পার্থিব অণু। একে পরমাণু আর বলা চল্‌ল না ; কেন না, নিজের আরও সূক্ষ্ম মশলা দিয়ে এটা তৈরি হল। তবে কেমিষ্ট্রির এটমের মতন এটা "কারবারি" পরমাণু বা ইউনিট হয়ে চলতে পারে। প্রাণাণু, মন-অণু, জীব অনু—এসব

প্রাচীনদের পরিচিত ছিল। শব্দাণু, রূপাণু এ সবই বা অপরিচিত বল্‌ব কেন? ওদেশেও Mind-Stuff এবং Mind-Dust থিওরি চলেছে। বিজ্ঞানের "জড়" (Matter and Energy)-কে খুব সূক্ষ্মরূপেই আমরা দেখতে পাচ্ছি—আরও পাব। এদের কৈফিয়ৎ যদি ভেতর থেকে দিতে হয়, আর যদি শুধু পরিমাণ নয়, গুণেরও কৈফিয়ৎ দিতে হয়, তবে, শব্দতন্মাত্রের পয়েণ্ট, রূপতন্মাত্রের পয়েণ্ট ইত্যাদি ভাবে বলায় কি সুবিধে বেশী হয় না? আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির জগৎটাকে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এই পাঁচটায় তৈরি দেখছি। কাজেই জগৎটার মূল ইউনিট, উপাদান Point-Event in Space-Time Continuum না বলে, "Event" বা ঘটনাটাকে শব্দ, রূপ ইত্যাদি পাঁচ রকমে নিরূপিত (determined) করে বলায় বোঝাপড়া কাজটা এগোয় না কি? গণিতে ইভেণ্ট হলেই চলে; সেটা শব্দ কি রূপ, তা অবান্তর; কেননা, তা নিয়ে মাপের হিসেব চলে না। কিন্তু জগতের মাপাজোকা হলেই ত সব মামলা মিট্‌ল না। এমন বিচিত্র রূপরসাদিতে তার অভিব্যক্তি কেন—এটাও ত' বোঝা চাই। নইলে বাস্তব (concrete) রকমের বোঝা হয় না। বাদসাদ দেওয়া বোঝা হয়।

দুচার কথায় তন্মাত্রের কথা বল্‌লাম। যোগসূত্রের যে প্রসঙ্গ তুলেছিলাম, তাতে সূক্ষ্মের পরও আর দু থাক্‌ অবস্থার কথা বলা হয়েছে। অন্বয় আর অর্থবত্ত্ব। প্রকাশ, প্রবৃত্তি, স্থিতি এই ধর্মবিশিষ্ট সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণত্রয় সর্বত্রই অনুগত, অন্বিত রয়েছে। তাদের ছেড়ে কোনও অবস্থাই নেই। জগৎপ্রপঞ্চের সকল অবস্থার ভেতর গুণত্রয়ের, আর তাদের প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও স্থিতি এই ধর্মত্রয়ের অন্বয় বুঝে দেখতে হয়। তাদের ভেতরে এমন কিছু আছে, যাতে করে তাদের প্রকাশ হচ্ছে (Presentation); আবার এমন কিছু আছে, যাতে করে তাদের বিবিধভাবে প্রবৃত্তি বা গতি হচ্ছে (Movement); আবার এমনও একটা কিছু সঙ্গে সঙ্গে আছে,

যেটা তাদের প্রকাশ আর প্রবৃত্তি দুটোকেই বাধা দিচ্ছে —খানিকটে ঢেকে খানিকটে প্রকাশ হতে দিচ্ছে, গতিকেও নিরঙ্কুশ হতে দিচ্ছে না। সেইটে Veil and Inertia। এই তিনটে যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। এই তিনটেই মিলে থাকে বলে জগতের সবই কতক ব্যক্ত, কতক অব্যক্ত (manifest and unmanifest, kinetic and potential); আর গতির মুখে বাধা (resistance) আছেই। তেল অগ্নি আর বর্তি এ তিন মিলে প্রদীপ হয়; এ তিনের যোগ্য সংযোগ হওয়া চাই; নৈলে এ তিনটে পরস্পর বিরুদ্ধ। তেলে সল্‌তের মুখ ডুবিয়ে দিলে জ্বলে না; আগুন তেল আর সল্‌তে দুইই পুড়িয়ে ফেলে। তিনটি গুণ বিরুদ্ধ হলেও, উপযুক্ত ভাবে মিলে, প্রদীপের তেল, আগুন, সল্‌তের মতন কাজ করে। কারিকা [৩৬] আর সাংখ্যসূত্রেও ঐ প্রদীপের দৃষ্টান্ত আছে। যাই হোক, গুণত্রয়ের বিচিত্র অথচ উপযুক্ত সংমিশ্রণ সব তাতেই আছে। পঞ্চতন্মাত্রের বিশেষ নেই, তা বলেছি। "শব্দাদিতন্মাত্রাণি সূক্ষ্মাণি, ন চৈষাং শান্তত্বাদিরস্তি, উপভোগযোগ্যো বিশেষ ইতি মাত্রশব্দার্থঃ"— বাচস্পতি (৩৮ কারিকায়)। স্থূল পৃথিব্যাদি ভূতে এবং যৌগিক পদার্থে শান্ত, ঘোর, মূঢ় এই তিন ধর্মের সবিশেষ আবির্ভাব দেখা যায়। কোনো কোনো জিনিসে শান্তভাব, সুখজনকতা, প্রকাশ, লঘুতা বেশী; আবার কোনো কিছুতে ঘোরভাব, দুঃখজনকতা, চাঞ্চল্য বা অনবস্থিত ভাব বেশী; আবার কেউ কেউ মূঢ়, অবসন্ন, জড়। এইরকমে স্থূল জিনিসগুলো পরস্পর আলাদা হয়ে উপভোগ-যোগ্য হয়ে আছে। কিন্তু তন্মাত্রগুলোকে এ রকমধারা পরস্পর-ব্যাবৃত্ত, কমবেশী শান্ত, ঘোর, মূঢ় এভাবে আমরা অনুভবে পাই না। এইজন্য তারা অবিশেষ। এ ভাবেও বিশেষ-অবিশেষ বোঝা যায় বটে। বিশেষ মানে শান্ত-ঘোরাদি ভাবে উপভোগযোগ্যতা। সাংখ্য-পাতঞ্জলে বিশেষ কথাটার এই হ'ল পারিভাষিক মানে। বৈশেষিকের বিশেষ মনে আছে ত?

তিনটে গুণ (ন্যায়বৈশেষিকের গুণ নয় এখানে দ্রব্য পদার্থ; পুরুষকে বাঁধে বলে গুণ) বিষম হলেই সৃষ্টি চলে; প্রকৃতির বিকৃতি বা পরিণাম হয়। আর সাম্য হলে, পরস্পরকে দাবিয়ে রাখলে, কার্য পরিণাম হয় না। সেই সাম্য বা equilibrium এর অবস্থাই প্রকৃতি। প্রকৃতির স্বরূপে বা স্ব-অবস্থায় পরিণাম নেই এমন নয়; সদৃশ পরিণাম আছে; বিসদৃশ বা তত্ত্বান্তরে বিকৃতিরূপ যে পরিণাম তা নেই। সদৃশ পরিণাম মানে মোটামুটি continuance in the given condition—যে ভাবে রয়েছে সেই ভাবেই পরিণাম। কথাটা পাড়লাম মাত্র।

তারপর, অর্থবত্ত্ব বলে একটা রূপ আছে। প্রকৃতির আর তার সন্ততিদের যা কিছু পরিণাম, সবই "পর" কিনা, পুরুষের ভোগ আর অপবর্গের জন্যে। তার নিজের জন্যে কিছুই নয়। প্রকৃতি যে নিজে দৃশ্য, ভোগ্য, জড় (জড় মানে ম্যাটার যেন না বুঝি)। সাংখ্যকারিকা (১৭) দেখিয়েছেন যে "সংঘাত" পদার্থ মাত্রেই, "পরার্থ"। যাহা অন্যের সঙ্গে মিলে কাজ করে, তার নাম সংঘাত বা সংহত। ক খ এর সঙ্গে মিলে পরপ্রয়োজন হাঁসিল করল; গ ঘ এর সঙ্গে ঙর প্রয়োজনঃ—এইরকম ধারা দেখ্‌ছি। মনে প্রশ্ন ওঠে—আচ্ছা, এমন কেউ কি নেই, যার জন্যে সকল সংহত পদার্থ কাজ কর্‌ছে, কিন্তু সে নিজে সংহত পদার্থ নয়? তার জন্যেই সব, কিন্তু সে, শেষ পর্যন্ত, কারুর জন্যেই নয়? সে আত্মা বা চৈতন্য বলা ছাড়া আর কি উত্তর দেব? চৈতন্যের সুখ-দুঃখ ভোগ আর দুঃখ থেকে অব্যাহতি—এইজন্যেই সব যোগাযোগ, বন্দোবস্ত; নয় কি? সংহতগুলো জড়, চেতন নয়; ভোগ্য, ভোক্তা নয়; পরার্থ, স্বার্থ নয়। যেটা সংহত, জড়, পরিচালিত, ভোগ্য, সেটার "পর", তা হ'তে আলাদা, একজন কেউ আছেনই, তিনি গুণত্রয়ের সংহতি নন, দৃশ্য, বা অচেতন নন, ভোগ্য নন, পরিচালিত নন। তিনি সব "দেখেন", কিনা, জানেন; সুখ-দুঃখ ভোগ করেন, যদিও সুখ-দুঃখ

সত্যিই তাঁতে নেই—প্রকৃতিরই ধর্ম ; তাঁর সান্নিধ্যে, প্রয়োজনে, অধ্যক্ষতায় প্রকৃতির সর্ববিধ প্রবৃত্তি হয়। অথচ তিনি কর্তা নন, তাঁর প্রবৃত্তি নেই। তিনি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ—"দৃশিমাত্র"—হ'লেও, তাঁতে প্রকৃতির সুখ-দুঃখ কর্তৃত্বাদি ধর্মের উপরাগ বা প্রতিফলন হচ্ছে ; প্রকৃতির ধর্মের অধ্যাস বা আরোপ তাঁতে হচ্ছে। এই আরোপটা ঘুচুতে পার্‌লেই "দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্"। "বৃত্তিসারূপ্য-মিতরত্র"—অধ্যাসটা থাক্‌লে চৈতন্যের বৃত্তিসারূপ্য হ'য়ে থাকে। চৈতন্যের বৃত্তি নেই, অথচ মনে হয় "আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কর্তা, আমি ঘটের জ্ঞাতা, পটের জ্ঞাতা" ইত্যাদি। বুদ্ধির অধ্যাস চৈতন্যে হয়, আবার চৈতন্যের অধ্যাসও বুদ্ধিতে হয়—এ দুরকমেই দেখতে হবে কিনা, সে বিচার টীকাকারেরা করুন, আমরা এখন কর্‌ব না। পুরুষ বা চৈতন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি আর তার পরিণাম বুদ্ধি, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি হ'তে আলাদা ক'রে চিনে নিলেই (প্রকৃতিবিবিক্তপুরুষসাক্ষাৎকারাৎ) পুরুষের কৈবল্য বা মুক্তি। সাংখ্যশাস্ত্র, এবং বিশেষ ক'রে, পাতঞ্জলদর্শন এই কৈবল্যে পৌঁছুবার রাস্তা বেশ ক'রে দেখিয়ে দিয়েছেন। পুরুষ কিন্তু এক নন, নানা। একের মুক্তিতে সব্বাইকার মুক্তি নয়। একের মুক্তি হ'লেও অন্যের জন্য প্রকৃতির "নাচ" চল্‌তে থাকে। বদ্ধ পুরুষের ভোগাপবর্গের খাতিরে প্রকৃতির যে প্রবৃত্তি হয় (গুণক্ষোভজন্য পরিণাম হয়), তাকেই পুরুষ-প্রকৃতির "সংযোগ" বলে। বাছুর দেখলে গাইএর বাঁটে যেমনধারা আপনি দুধ আসে, পুরুষকে দ্রষ্টা ও ভোক্তা ভাবে হাজির পেলেই, তেমনিধারা প্রকৃতির সব পরিণাম হ'তে থাকে। পুরুষ "উদাসীন" হ'লে, প্রকৃতির পরিণাম অবশ্য বন্ধ হয় না ; কিন্তু সুখ-দুঃখাদি প্রকৃতির ধর্মগুলো আর পুরুষে গিয়ে পড়ে না। সুখ-দুঃখ চৈতন্যের ধর্ম নয়, জড়ের (Matter নয়)—দৃশ্যের, ভোগ্যের—ধর্ম, এ একটা মস্ত বড় কথা। প্রকৃতিতে পুরুষের কর্তৃত্ব নেই—the Realm of Nature is a closed

curve—কিন্তু কেমিষ্ট্রিতে যেমন catalytic action (কোন একটা কিছু উপস্থিত থাক্‌লেই একটা ব্যাপার হয়, অথচ সে ব্যাপারে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সে লিপ্ত নয়), তেমনিধারা পুরুষের ভোগাপবর্গ প্রয়োজন উদ্দেশ ক'রেই প্রকৃতির সব কাজ হয় ; পুরুষ দেখছেন, ভোগ করছেন—এই অজুহাতটা থাক্‌লেই পর্যাপ্ত ; তাঁর আর কিচ্ছু করার দরকার নেই। সত্যি সত্যি আর কিছু করার এক্তারও নেই। শুধু জানাটা আর "ছাপ" নেওয়াটাই পুরুষের ভাগে ; আর, সুখ-দুঃখ, প্রবৃত্তি, নানান্ রকমের করণ, তাদের বিষয়, স্থূল ও সূক্ষ্ম—এ সমস্তই প্রকৃতির ভাগে। করণগুলো পরস্পরের আকূত (impetus) বশতঃই কাজ কর্‌তে চায় ; অনাগতাবস্থ যে পুরুষার্থ (অদৃষ্ট), সেইটে তাদের প্রবৃত্তির হেতু ; কোনও কর্তা তাদের চালায় না (৩১ কারিকা)। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রকৃতির প্রবৃত্তি-ব্যূহের ভেতরে, বাইরের কারুর, কোনও কর্তার, প্রবেশাধিকার নেই। অথচ, সে ব্যূহের রচনা এবং কর্ম পরকে উদ্দেশ ক'রেই—পুরুষার্থের জন্যেই—হচ্ছে। কাণা ও খোঁড়া দুজনে কেউই ঠিক চল্‌তে পারে না, কিন্তু কাণা খোঁড়াকে ঘাড়ে ক'রে, তার কথা-মত, ঠিক চল্‌তে পারে। দৃষ্টান্ত সব রকমে লাগসই নয় (২১ কারিকা), কিন্তু কাণা (কিনা জড়) প্রকৃতি আর খোঁড়া (কিনা অকর্তা সাক্ষিমাত্র) পুরুষের "সংযোগে" সৃষ্টি যাত্রাটা খাসাই চল্‌চে।

সুখ, দুঃখ, সঙ্কল্প, বিকল্প, অভিমান, অধ্যবসায় বা নিশ্চয়, যত্ন, কৃতি—এ সব, সোজাসুজি হিসাবে, আমরা চেতন আত্মায় বা আমাতেই আছে ভাবি ; ন্যায়-বৈশেষিক এই সোজা হিসাবেই চ'লেছিল। কিন্তু সাংখ্য-পাতঞ্জল এ সবই অচেতন প্রকৃতির ভাগে ফেল্‌লেন। জগৎটাকে জরাসন্ধবধ ক'রে—এক দিকে রাখলেন যেটি জান্‌ছে আর ভোগ কর্‌ছে (দ্রষ্টা, সাক্ষী, ভোক্তা), আর এক দিকে ফেল্‌লেন যা কিছু জ্ঞেয় হচ্ছে, ভোগ্য হচ্ছে। এই দৃশ্য, ভোগ্যটা

হচ্ছে প্রকৃতি আর বিচিত্র পরিণাম-প্রপঞ্চ। চৈতন্য বা জ্ঞান স্বপ্রকাশ। প্রকৃতি প্রভৃতি প্রকাশ্য। এইজন্য জড়, অচেতন। যাতে সত্ত্বগুণ বেশী থাকে, তাতে "স্বচ্ছতা" বেশী হয়, অর্থাৎ, চৈতন্যের প্রতিফলন তাতে বেশী হয়। এইজন্য বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন—এদের বৃত্তিগুলোতে "চিচ্ছায়াপত্তি" বেশী হয়—তা'দিগকে চেতন ব'লেই মনে হয়।

সাংখ্যকারিকা ২২ থেকে আরম্ভ ক'রে কয়টা শ্লোকে প্রকৃতি হ'তে আরম্ভ ক'রে স্থূল ভূতপ্রপঞ্চের পরিণামের ক্রম দেখিয়েছেন। মূল প্রকৃতির যা লক্ষণ, তাতে সেটি বিশ্বের (অন্তঃকরণেরও) রহস্যময় বীজ ; Psycho-physical Radical ; বেদান্ত এইটিকেই, একটু বদলে নিয়ে, অনির্বচনীয়া মায়া বল্‌বেন। ন্যায়-বৈশেষিক শুধু পরমাণুপুঞ্জ, দিক্, কাল, আকাশ, আর পরমেশ্বরের যত্ন কৃতি দিয়ে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় বোঝাতে পারেননি। তাঁকেও "অদৃষ্ট" ব'লে একটা কিছু মান্‌তে হ'য়েছিল। তলিয়ে বুঝতে চাইলে, দৃষ্ট হচ্ছে ব্যক্ত, অদৃষ্ট হচ্ছে অব্যক্ত। শুধু যা কিছু ব্যক্ত (manifest, kinetic, actual), তা দিয়ে জগৎটাকে বোঝা যায় না। একটা unmanifest, potential কিছু মানতেই হয়। কর্ম বা গতি দিয়ে এই 'অদৃষ্ট" তৈরি হচ্ছে, আবার কর্মের পেছনে এটি র'য়েছে। বীজাঙ্কুরন্যায়। Actual-Potential-এর এই cycleটি সাংখ্য প্রকৃতি-বিকৃতি, অব্যক্ত-ব্যক্তের পরিণাম দিয়ে খাসা ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথম প্রস্থানের কর্ম আর অদৃষ্টবাদের ভেতরেই সঙ্কেত দেওয়া ছিল। অদৃষ্ট প্রত্যেকের "পজিসন" বিশ্বব্যবস্থায় ঠিক করে। এটি Static Energy। এর পেছনে শক্তিকূটের একটা সাম্যাবস্থা (equilibrium) থাকে, যাতে ক'রে এক একটা জিনিসকে এক একটা পজিসনে "বেঁধে" রাখতে চায়। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রকৃতিতেও সব বীজভাবে স্থির থাকে। গুণগুলোর ক্ষোভ, বৈষম্যই কর্ম। তাতে ক'রে বিকৃতি, পরিণাম, পরিবর্তন হয়। ঈশ্বর সৃষ্টির

সময় অদৃষ্টসহকৃত হ'য়ে কর্ম করেন—ন্যায়ের একথা সাংখ্যের ভাষায় তা হ'লে কি ভাবে অনুবাদ কর্‌তে হবে?

প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি। অধ্যবসায় তার ধর্ম। "এটা এই"—এইরকম নিশ্চয় হ'লে প্রবৃত্তি হয়। বুদ্ধি এমন একটা অবস্থা বা তত্ত্ব, যাতে অব্যক্ত (indeterminate) প্রথম ব্যক্ত বা নিরূপিত (determinate) হয়। নিরূপিত না হ'লে, তা হ'তে একটা নির্দিষ্ট দিকে বা ক্রমে ক্রিয়া হ'তে পারে না। অব্যক্ত নিজে পরিমাণের বাইরে, কিন্তু প্রথম নিরূপণে (determination এ) তার পরিমাণ এল—মহৎ—vast, great। তারপর, এটা আরও একরকমে নিরূপিত হওয়া আবশ্যক—তাতে—নানান্ "ব্যক্তিকেন্দ্র" (Points or Centres of Individuality) ফুটে ওঠা আবশ্যক। প্রথম নিরূপণ মহান্, তার পরের নিরূপণ বিন্দু; তন্ত্র বল্‌বেন—নাদ ও বিন্দু। অন্তঃকরণের স্তরে ঐ বিন্দুই হচ্ছে "অহঙ্কার", যাতে ক'রে "আমি" "আমার" অভিমান হয়। তারপর, এই ব্যক্তিত্বরূপে নিরূপণের পর দ্বিবিধ পরিণামধারা হয়—একটা ধারা হ'ল ভোগ্য বা বিষয়ের যা যা সূক্ষ্ম উপাদান (পঞ্চতন্মাত্র), আর এক ধারা হ'ল তা'দিগকে গ্রহণ করার এগারটা (মন সমেত) ইন্দ্রিয়। শেষকালে সূক্ষ্ম বিষয় হ'তে স্থূল বিষয়—পঞ্চ মহাভূত। এই চব্বিশ দফা তত্ত্ব। পুরুষকে নিয়ে পঁচিশ।

পাতঞ্জলে বুদ্ধি থেকেই দুটো ধারা—একদিকে "অহং" বা আমিরূপ কেন্দ্র, অন্য দিকে, তার ভোগ্য "ইদং" এর সূক্ষ্ম কেন্দ্র—Points of Subject or Ego, আর Points of Object (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ)। তা ছাড়া, পাতঞ্জল ঈশ্বর মানেন—যিনি ক্লেশ, কর্ম, বিপাকাশয় দ্বারা অপরামৃষ্ট, নিরতিশয়রূপে সর্বজ্ঞ, প্রণবের বাচ্য, আদি গুরু, পুরুষবিশেষ। তিনি কিন্তু প্রকৃতির বা পুরুষের স্রষ্টা, এবং তাদের সংযোগ-বিয়োগের কর্তা নহেন। উপাসনাদির জন্য এঁকে চাই। নিরীশ্বর সাংখ্য ঈশ্বর বাদ দিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম প্রমাণে তাঁকে সাধা যায় না ; বৈরাগ্যশাস্ত্র ব'লে—ঐশ্বর্যে কামনা থাক্‌লে বৈরাগ্য হবে না ব'লে—বাদ দিয়েছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু এ কথা ধ'রেছেন। সা, প্র, সূ, ১ম অধ্যায় —১২, ১৩, ১৪, ১৫ সূত্রগুলি দ্রষ্টব্য। তৃতীয় অধ্যায়, ৫৬, ৫৭ সূত্রও। আমরা এদের বিচার কর্‌ব না, তবে এদের মূল বক্তব্য এই যে, প্রকৃতি আর তার কার্য থেকে পুরুষের নিজেকে আলাদা ক'রে জানাটাই দরকার। তার জন্যে ঈশ্বর মানার দরকার নেই। কারিকার (৫৬, ৫৭) ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি প্রকৃতির প্রবৃত্তির নিমিত্ত ঈশ্বর না মানার—মানলে উপকার নেই বরং হানিই হয়—এই রকমের যুক্তি দিতে ছাড়েন নি।

সাংখ্যমত (সংখ্যা = "সম্যগ্‌বিবেকেনাত্মকথনমিতি') খুব প্রাচীন। শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি উপনিষদেই এর পরিচয় পাই। সেশ্বর আর নিরীশ্বর—এই দুটো ধারাই বরাবর চ'লে আস্‌ছে। এখন সেশ্বর সাংখ্য বল্‌তে প্রধানতঃ পাতঞ্জলই বোঝায়। সাংখ্যের সেশ্বর রূপ মহাভারতাদিতে (অনুগীতা, ভগবদ্‌গীতা ইত্যাদিতে), ভাগবত মতে (চতুর্ব্যূহাদি তত্ত্বে), পঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তে, শৈবশাক্তাদি তন্ত্রমতে, পুরাণাদির সৃষ্টিতত্ত্বে কতকটা যেন লুকিয়ে র'য়েছে। সাংখ্যদর্শন বল্‌তে এখন নিরীশ্বর সাংখ্যই বেশী ক'রে বোঝায়। কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ প্রভৃতি প্রাচীন ঋষি সাংখ্যমত ব'লেছিলেন। তত্ত্বসমাস, ষষ্টীতন্ত্রাদি পুরোণো পুঁথিও ছিল। এখন সাংখ্যকারিকা, সাংখ্যসূত্রই বেশী চল। বৌদ্ধদেরও অনেক মত আর সাধনের ওপর সাংখ্যের প্রভাব বেশ দেখতে পাওয়া যায়।

সাংখ্যপাতঞ্জল চিকিৎসাশাস্ত্রের মতন, হেয়, হেয়হেতু, হান আর হানোপায়, এই চতুর্ব্যূহের আলোচনা ক'রেছেন। ত্রিবিধ দুঃখই হেয় (পাতঞ্জলে—"হেয়ং দুঃখমনাগতম্")। হেয়হেতু হচ্ছে অবিদ্যা বা প্রকৃতি-পুরুষের অবিবেক—আলাদা ভাবে না বোঝা ; আত্মা কেবল সাক্ষিমাত্র, এই জ্ঞান না থাকা—"দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ"

—পাতঞ্জল, ২।১৭ ; হান হচ্ছে ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি ; আর হানোপায় হচ্ছে প্রকৃতি হ'তে সম্পূর্ণ আলাদা ক'রে, কেবল শুদ্ধ নিরঞ্জন সাক্ষিচৈতন্যরূপে আপনাকে সাক্ষাৎকার করা। যখনই এই আত্মবিবেক হ'বে, তখুনি প্রকৃতি আর তার কার্য প্রপঞ্চ, পুরুষ থেকে স'রে দাঁড়াবে—তাতে আর নিজেদের সুখ-দুঃখাদি ধর্ম, কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অভিমানের ছায়া ফেল্‌বে না। অনাদি অবিদ্যা সংস্কার একদণ্ডেই—আলো জ্বাল্‌লে হাজার বছরের অন্ধকারের মতন—খসে পড়্‌বে। তাই কৈবল্যমুক্তি। সাংখ্যযোগ দর্শনগুলির মধ্যে খুবই প্রাক্‌টিকাল। পরীক্ষা বা এক্‌সপেরিমেণ্টই হ'ল টেষ্ট। এঁরা প্রত্যক্ষ, অনুমান আর আগম এই তিন প্রমাণই মানেন। তবে যুক্তিপ্রধান দর্শন হিসাবে।

সাংখ্য, এবং বিশেষভাবে, যোগ এই অবস্থায় পৌঁছুবার রাস্তা বেশ ক'রে দেখিয়েছেন। বিবেকখ্যাতি চাই, তার জন্যে পুরুষকে বা আত্মাকে "উদাসীন" হ'তে হবে। যোগ একটা বিশাল আধ্যাত্মিক রাজ্যের সায়েন্স। সায়েন্স এবং আর্টের মতনই এর সবিশেষ অনুশীলন এ দেশে হয়েছিল। জড়, প্রাণ, মন এ সকলের স্বরূপ আর শক্তি বুঝতেও সায়েন্স কম সাহায্য কর্‌বে না। আমরা সাংখ্যযোগে ওপর ওপর হাত বুলিয়ে গেলাম মাত্র। গভীর তত্ত্ব কথায় এবং সুচিন্তিত সাধনোপায় নির্দেশে এরা সমৃদ্ধ। আমরা "মন্ত্র যন্ত্র তন্ত্র" বইখানাতে যোগের কথা আরও একটু ভাল ক'রে বল্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

চতুর্থ অধ্যায়

মীমাংসা

পূর্ব আর উত্তর—এই দুই মীমাংসা আছে। পূর্ব-মীমাংসাকে কর্ম-মীমাংসা আর উত্তর-মীমাংসাকে ব্রহ্মমীমাংসাও বলা হয়। আমরা এই শেষ অধ্যায় কর্মমীমাংসা সম্বন্ধেই দুচার কথা বল্‌ব। ব্রহ্ম-মীমাংসা বা বেদান্তের কথা সংক্ষেপে শোনাবার জন্যে আর একখানা বই লেখার ইচ্ছা রইল। আর কর্মের কথাও একটুখানি তলিয়ে বোঝার যত্ন অন্যত্র কর্‌ব ভেবেছি। এখানে মোটা মোটা দুচার কথা।

মীমাংসা দর্শন বল্‌তে সাধারণতঃ জৈমিনির কর্মমীমাংসা, এবং সেইটাকে অবলম্বন ক'রে যে বিশাল শাস্ত্র গ'ড়ে উঠেছিল, তাকেই বোঝায়। এই শাস্ত্রের যিনি অনুশীলন করেন, আর এ শাস্ত্রে যিনি কুশলী, তিনি মীমাংসক। বলা বাহুল্য, জৈমিনি এ শাস্ত্র উদ্‌ভাবন করেন নাই। বাদরি, আত্রেয়, বাদরায়ণ, ঐতশায়ন প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যদের উল্লেখ ত' আছেই, তা ছাড়া, এটা মনে রাখ্‌তে হবে যে, যজ্ঞাদি বৈদিক কর্মের ধারা যেমনধারা স্মরণাতীত যুগ হ'তে চ'লে আস্‌ছে, তেমনি তাদের বিধি-নিষেধের ব্যবস্থানিরূপক একটা শাস্ত্র (মৌখিক উপদেশমালা ভাবেই হোক্ আর সূত্রাকারে নিবদ্ধ ভাবেই হোক্) সঙ্গে সঙ্গে চ'লে আস্‌ছে। সেটাকে "ন্যায়" বলা হ'ত, মীমাংসাও বলা হ'ত। দুটো নামই প্রাচীন। ন্যায়দর্শন "ন্যায়" কথাটাকে একটা বিশিষ্ট অর্থে নিয়েছেন, দর্শন হিসেবে নামটা নিজে আত্মসাৎ কর্‌তে চেয়েছেন। কিন্তু মীমাংসাদর্শন "ন্যায়" নামটার ওপর নিজের দাবী কখনই ছাড়েন নি। আর, দেখ্‌তে পাই—এই দুটো "ন্যায়ের" ভেতরেই লড়াইটা হ'য়েছে বেশী।

"জ্ঞাতিশত্রু" বড় শত্রু। জ্ঞান কি ক'রে হয়, প্রত্যক্ষ অনুমান এ সব নিয়ে ঝগড়া ত' আছেই ; তাছাড়া, ঝগড়ার মূল কারণ হ'য়েছে—মীমাংসা ঈশ্বরকে ঠাঁই দেন নি, কাজেই জগতের সৃষ্টি সংহার, বেদাদির রচনা, এ সব ব্যাপার মানেননি ; কিন্তু ন্যায় ঈশ্বর মেনেছেন, সৃষ্টি আর লয় মেনেছেন, বেদ যে সর্বজ্ঞ ঈশ্বরপ্রণীত এও মেনেছেন। ধর্ম দুজনাই মানেন। বেদই ধর্মের আকর—এতেও দুজনে একমত।

কথাটা শুনলে আশ্চর্য মনে হবে, কিন্তু এ কথা ঠিক যে, আধুনিক যুগের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চিন্তার তলে যে মনোভাব (attitude) র'য়েছে তার সঙ্গে মীমাংসার ভেতরকার মনোভাব মেলে। এক কথায়, মীমাংসা একটা সায়েন্স। কেবল কর্মের বিধি-নিষেধাদি—কোন্ কর্ম কি ভাবে কর্তে হবে ; বিরোধস্থলে, সংশয়স্থলে কি কর্‌ব, ইত্যাদি—বিচারের যে সায়েন্স (Science of Interpretation and Procedure), তাই নয়। কর্ম কর্‌তে গেলেই—বিশেষতঃ কর্ম যেখানে জটিল, তার নানা অঙ্গ ইত্যাদি র'য়েছে—সেখানে এরকম ধারা বিচারপূর্বক ব্যবস্থা করার অপেক্ষা ত' সব সময়েই আছে। তাছাড়া, আর একভাবেও দেখ্‌তে হবে।

বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে বেতার যন্ত্র নিয়ে অথবা একটা নতুন ঔষধ নিয়ে পরীক্ষা চল্‌ছে। কি কর্‌তে হবে না হবে, তা নিয়ে অভিজ্ঞ পরীক্ষকদের উপদেশ—মৌখিক ভাবেই হোক্ আর লিখিত ভাবেই হোক্—প্রচলিত আছে। সে উপদেশ এমন, যাতে ক'রে ঐ ঐ কর্মে সফলতা হ'তে পারে। উপদেশের মধ্যে কতকগুলো সামান্য বা সাধারণ বিধি আছে, আবার কতকগুলো বিশেষ বিধি আছে। উক্ত বেতার পরীক্ষায় সেই সমস্ত বিধির কিভাবে প্রয়োগ কর্‌তে হবে না হবে—তাদের অসঙ্গতি হ'লে কি করা কর্তব্য, নূতন স্থলে তাদের কি আকারে ব্যবহার কর্‌তে হবে—এ সব ভাল ক'রে ভেবে নিতে হয়। একটা জটিল যন্ত্রের সামান্য একটা পিন্ স্থানচ্যুত

হ'লে, অথবা সেটাকে চালাবার যে যে অনুষ্ঠান বিহিত, সেগুলো সামান্য একটুখানি নড়চড় হ'লে—সে যন্ত্র আর সফল ভাবে চলে না। পিন্‌টা না থাক্‌লে যে কি আট্‌কায়, অথবা অনুষ্ঠানের অঙ্গ-বিশেষের হানি হ'লে যে কি দোষ হয়, তা সমজদার ব্যক্তি আমাকে হয়ত বুঝিয়ে দিতে পারেন। অর্থাৎ, সে সবের মূলে যুক্তি আছে। যুক্তি অবশ্য সব তাতেই আছে; কিন্তু এমন হওয়া আশ্চর্য নয় যে পরীক্ষক হয়ত অনেক কিছুর যুক্তি জানেন না, অথচ, অভিজ্ঞদের উপদেশ মত ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান ক'রে পুরো ফল পেলেন। গ্রামোফোন বা বেতারের "তত্ত্ব" আমরা অনেকেই জানি না, কিন্তু উপদেশমত কাজ ক'রে তাদের ঠিক ঠিক ব্যবহারে লাগাতে পারি। আবার এমনও স্থল আছে, যেখানে, যুক্তি শুধু আমার নয়, হয়ত কাহারোই জানা নেই; অথচ এই কর্‌লে এই হয়—এভাবে একটা পরীক্ষিত বিধিপ্রয়োগ (tradition of fruitful practice) চ'লে আস্‌ছে। মকরধ্বজে নাকি সোণা ঢোকে না—রাসায়নিক দেখিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু তবুও কোনো কবিরাজ মহাশয় কি সোণা বাদ দিয়ে সিদ্ধ মকরধ্বজ তৈরি কর্‌তে ভরসা পাবেন? সে রকমের মকরধ্বজে কি তিনি ঠিক ফলের আশা করেন? বিজ্ঞানেও এ রকম রাশি রাশি দৃষ্টান্ত র'য়েছে—যেখানে প্রয়োগবিধির উপদেশ চল্‌ছে, তাতে ফলও পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু মূলের যুক্তি কারুরই জানা নেই। তাছাড়া, এও মনে রাখ্‌তে হবে যে যুক্তির শিকল যে ক্ষেত্রে চেপে ধর্‌তে পারি, সে ক্ষেত্রে তার দুচারটে আংঠাই ধরতে পারি—কতকদূর পর্যন্ত বুঝলাম কিসে কি হ'ল—কিন্তু, তার পর আর আমাদের দৌড়, অন্ততঃ তখনকার মতন, নেই। কুইনিন খেলে ম্যালেরিয়া জ্বর কেন সারে, তার কৈফিয়ৎ হালের শারীরতত্ত্ববিৎ কিছুটা যে দিতে না পারেন, এমন না, কিন্তু, খানিকদূর এগিয়ে তাঁকে স্বীকার কর্‌তেই হয়—বস্—এই পর্যন্ত একরকম বোঝা গেল; আপাততঃ আর "কেন"র জবাব আমরা জানি না।

এখন, আজকাল বিজ্ঞান একটা রাস্তা ধ'রে চল্ছেন ; কিছু কিছু ফলও আমরা তাঁর প্রসাদে পাচ্ছি। সেকালে দেখি সকল প্রাচীন দেশে (এমন কি, অসভ্য বর্বরদের ভেতরেও) কতকগুলো বিশিষ্ট অনুষ্ঠান চল ছিল। কেউ কেউ তাদের নাম দিয়েছেন "ম্যাজিক্"। আমাদের দেশে মোটামুটি তাদের "যজ্ঞ" বলা হ'ত। কল্‌কাতায় কোনো ভাল ওস্তাদের গান তুমি নিজের ঘরে ব'সে শুন্‌তে চাও ; আচ্ছা, কাণে বেতার যন্ত্র লাগাও, শুন্‌তে পাবে। প্রাচীনরা বল্‌ছেন —তুমি অপুত্রক, পুত্র কামনা কর ; পুত্রেষ্টিযাগ কর, পুত্র হবে ; অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি চাও, কারীরীষ্টি কর, বৃষ্টি হবে ; ইত্যাদি। বেতারের বেলা যেমন যন্ত্র নিখুঁত, আর তার ব্যবহার যথাযথ হওয়া আবশ্যক, ঐ সব যাগযজ্ঞের বেলাতেও তেমনি সব ঠিকঠাক হওয়া আবশ্যক। কেন কর্‌ছি তার যুক্তি বুঝিনে বল্‌লে রেহাই নেই। বিজ্ঞানেও অনেক কিছু সফল অনুষ্ঠানের মূল যুক্তি আমরা বুঝি না ; হয়ত বৈজ্ঞানিকও বোঝেন না। ঋত বা নিয়মের যথাযথ পালন— কিছুতেই অঙ্গবৈকল্য হ'তে না দেওয়া—এইটেই হ'ল সফলতার আসল কথা। উভয় ক্ষেত্রেই।

এ জগৎটা ঋত বা নিয়মের দ্বারা শাসিত—ঋত অনুসরণের ফল হ'তেই হবে—এইটে হ'ল বিজ্ঞানের গোড়ার বিশ্বাস। বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর মান্‌তে পারেন, কিন্তু, সে মানা না-মানার সঙ্গে তাঁর বিজ্ঞানের, তাঁর আচরিত বৈজ্ঞানিক কর্মের, আর তার ফলের কোনই স্পষ্ট সম্পর্ক নেই। কর্মমীমাংসারও এই কথা। ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন, তুমি যজ্ঞাদি কর্ম ঠিক ঠিক ভাবে কর, তার ফল পাবেই। আর তিনি বলেন—ঐহিক পারত্রিক সকল রকম ফলই উপযুক্ত কর্মের দ্বারা লাভ করা যায়। কর্মের চাইতে বড় আর কেউ নেই। বিজ্ঞানেরও কথাটা অনেকটা এইরূপ।

যে সমস্ত কর্ম দৃষ্টফল—যেমন আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে, জল খেলে পিপাসা যায়—এ সবের জন্যে অসাধারণ উপদেশ

নেওয়ার অপেক্ষা নেই। নিজের নিজের অভিজ্ঞতাই হয়ত যথেষ্ট। কিন্তু শান্তিহোম করলে যে বিঘ্নশান্তি হবে, অথবা গায়ত্রীজপ কর্‌লে যে পাপ দূর হবে—এর খানিকটে যুক্তি দিয়ে হয়ত বুঝতে পারা যায়, কিন্তু সবটা নয়। সেখানে অতীন্দ্রিয়, অসাধারণ উপদেশের অপেক্ষা আছে। তাই যেখানে আছে, সেটা মোটামুটি বেদ।

কর্মমীমাংসা ঈশ্বর নিয়ে যত্ন করেন নি, কিন্তু বেদ তাঁর মুখ্য আশ্রয়। বেদ তাঁর দৃষ্টিতে একটা অভ্রান্ত, যথার্থ উপদেশের সমষ্টি ; যেটা বরাবরই চ'লে আস্‌ছে। জ্ঞানের একটা অনাদি ধারা চ'লে আসছে—কথাটা উড়িয়ে দেবার নয়। কেউ কোনদিন র'চেছেন, একথা বলার চাইতে—এ জগৎ আর তার মূল ঋত বা নিয়মগুলো যেমন একভাবে না একভাবে বরাবরই চল্‌ছে ও চল্‌বে, তেমনি সেই ঋত প্রভৃতির জ্ঞানও একটা অবিচ্ছিন্ন ধারার মতন চ'লে আস্‌ছে, কোনও ব্যক্তিতে তার সবখানি ফুটে উঠুক আর নাই উঠুক—একথা বলায় লাঘব বেশী আছে মনে হ'তে পারে। আজকালকার দর্শনেও একটা বিরাট নিখিল জ্ঞানের আশ্রয় "সাব্ কন্‌সাস্‌নেস্" মানার দিকে ঝোঁক্ না গিয়েছে এমন নয়। বেদের পুঁথি ক'খানা সেই পূর্ণ অপৌরুষেয় (এক ভাবে impersonal) বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে যথাসম্ভব বিশুদ্ধ, কিন্তু আংশিক অভিব্যক্তি। যেন একটা বিপুল ওয়ার্‌লেসের খানিকটে কোনো কোনো যন্ত্রে ধরা প'ড়েছে। সেই ব্যক্তিবিশেষ হচ্ছেন ঋষি। কথাটা পাড়্‌লাম মাত্র। অনেক প্রশ্ন মনে ওঠে। অন্য যায়গায় আরও কিছু বল্‌বার ইচ্ছা রইল।

বেদের মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগ। এই বেদ অথবা আম্নায় কোনো ফলের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু কর্ম আমাদের করতে বলেন ("আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ)। বিধি (অথবা নিষেধ) হইতেছে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরোক্ষভাবে, সমস্ত বাক্যের উদ্দেশ্য। অবশ্য, মন্ত্র এবং

ব্রাহ্মণ এই দুই অংশেরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ ছাড়া অন্য রকমেরও শব্দসমষ্টি আছে। সেগুলো নামধেয় অথবা অর্থবাদ। অর্থবাদও নানা রকমের (সাধারণ হিসাবে তিন রকমের) আছে। অর্থবাদ বিধির স্তুতি (বিধি মান্‌লে সুখ হয়, স্বর্গ হয় ইত্যাদি) অথবা নিষিদ্ধ কর্মের নিন্দা করে; কাজেই, তাতে বৈধ প্রেরণা হ'য়ে থাকে; এইজন্যে বেদাদিতে যে সব অর্থবাদ আছে, সেগুলো অনর্থক নয়। মীমাংসা সূত্রের প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদের কতকগুলি সূত্রে, এবং চতুর্থ পাদের কতকগুলি সূত্রে অর্থবাদ আর নামধেয় নিয়ে আলোচনা আছে। ফল কথা, চেষ্টা হ'য়েছে সমস্ত বেদ-বাক্যকেই, এক না এক ভাবে, কোন না কোনো বিধির প্রতি উদ্দিষ্ট ক'রে নেওয়া।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিধি বা নিষেধের কথা ব্রাহ্মণভাগেই বেশী। তবে অর্থবাদ আর নামধেয়ও প্রচুর আছে। "স্বর্গকামো যজেত"—এসব ব্রাহ্মণভাগেরই বাক্য। মন্ত্রভাগ (ঋক্, সাম, যজুঃ) সাক্ষাদ্‌-ভাবে বিধি-নিষেধ নির্দেশ করেন না বটে, কিন্তু যজ্ঞাদির উদ্দিষ্ট দেবতাদের স্তুতি ইত্যাদি তাঁরা করেন। এভাবে এসকলও কর্মের উপকারক। গোঁড়া মীমাংসকেরা কর্মের নিজের সামর্থ্যে এতটা আস্থাবান্, এবং তাঁদের এতটা "বৈজ্ঞানিক" মেজাজ, যে, তাঁরা অনেকে এ কথা বলেন না যে, স্তবস্তুতি কর্‌লে দেবতারা তুষ্ট হ'য়ে ফল দেবেন, তাই ও সমস্ত মন্ত্রের দরকার; যেমন, বেতারের যন্ত্র আর তার ব্যবহার ঠিক ঠিক হ'লেই তার কাজ যা, তা হবেই, তাতে কারুর তুষ্টি-রুষ্টির অপেক্ষা নেই, সেইরকম কর্ম সব রকমে ঠিক ঠিক হ'লেই সে তার "অপূর্ব" (ফল দেবার অদৃষ্ট সামর্থ্য) জন্মাবেই। বিগ্রহবিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে দেবতারা সত্য সত্যই আছেন কি না, তা নিয়ে পরের অনেক মীমাংসক (যথা, আপদেব তাঁর দেবতা-স্বরূপবিচারে) "না" এই মত প্রকাশ ক'রেছেন। এঁরা বলেন, পুরাণাদিতে দেবতাদের যে রূপগুণের বর্ণনা দেখা যায়, সে সব

অর্থবাদ। অবশ্য যজ্ঞ-হোমাদি করতে গেলে কাউকে উদ্দেশ ক'রে আজ্যাদি আহুতি দিতে হয়, মন্ত্রাদি উচ্চারণ কর্‌তে হয়, কিন্তু আহুতি বা মন্ত্রের উদ্দিষ্ট (conceptual object—বিজ্ঞানে ঈথার প্রভৃতিকে কেউ কেউ যেমন এখনও মনে কর্‌ছেন) রূপেই তাঁরা আছেন। অন্যভাবে সত্য সত্যই নেই। যেন আছেন মনে ক'রেই আহুতি দিতে হয়, মন্ত্র পড়্‌তে হয়। প্রাচীন মীমাংসাচার্যদের দেবতা (একটা নাম, একটা লক্ষিত বা উদ্দিষ্ট পদার্থ—Concept—এ ভাবে ছাড়া অন্যভাবে) নেই—এটা স্পষ্ট ক'রে বল্‌তে দেখি না। তবে, যজ্ঞাদি কর্মে উৎপন্ন অপূর্বের শক্তিতে এতটা আস্থা তাঁদের সকলেরই, যে, কেবল আহুতি বা মন্ত্রের লক্ষিত পদার্থ ভাবেই দেবতারা আছেন, তদতিরিক্ত ভাবে নেই—এইটুকু মেনে নেওয়াতেই কাজ চল্‌তে পারে ;—এটা স্বভাবতই মনে এসেছে। এখানেও সেই বৈজ্ঞানিকের মেজাজ।

তবে দেবতাদের অদৃষ্টে যাই হোক, ঈশ্বর যে মীমাংসা হ'তে চিরনির্বাসিত হ'য়েছেন, এমন নয়। সেশ্বর মীমাংসাও ফুটে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে বেঙ্কটেশের নাম উল্লেখযোগ্য। সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থেও পরমাত্মা ঠাঁই পেয়েছেন, এবং তাঁতে ধ্যান-ধারণা শ্রেষ্ঠ ফলদায়করূপে বিহিত হ'য়েছে। সাংখ্য আর পাতঞ্জলের কথা মনে পড়্‌ছে। সাংখ্য ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে সরাসরি কৈবল্যে পৌঁছুবার রাস্তা দেখাচ্ছেন; যোগ ঈশ্বর-প্রণিধানটাকেও সমাধির একটা উপায় ব'লেছেন। কর্ম আর তার অপূর্ব (যে ফলদানসামর্থ্য অনুষ্ঠানের পূর্বে ক্রিয়াতে বা কর্তাতে ছিল না, অনুষ্ঠানের দ্বারা যেটা উৎপাদিত হ'ল; ন্যায়ের প্রাগভাবের কথা মনে আসে)—এ দুয়ের যাঁরা গোঁড়া, তাঁরা ঈশ্বর আর দেবতাদের "অস্তিত্ব" যে কেন আমোল দেন নি, সেটা যেন আমরা তলিয়ে বুঝি। আমরা আর এক বইয়ে সে চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব।

অপূর্ব আর অদৃষ্ট এক রকমের জিনিস। একটা যজ্ঞ বিহিত

র'য়েছে, আমিও র'য়েছি। যতক্ষণ যজ্ঞটার আমি অনুষ্ঠান না করছি, ততক্ষণ সে যজ্ঞেরও তার ফলটি দেবার সামর্থ্য নেই, আমারও তার ফলটি পাবার সামর্থ্য নেই। যেই ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান হ'ল, সেই সে সামর্থ্য এল। সামর্থ্য যে সঙ্গে সঙ্গেই ফল দেবে এমন কথা নেই। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সঙ্গে তুলনা কর্‌তে পারি। অপূর্ব জিনিসটাকে —অঙ্গাপূর্ব, উৎপত্ত্যপূর্ব, সমুদায়াপূর্ব আর ফলাপূর্ব ক'রে দেখা হ'য়েছে। একটা কাজের নানান্ অঙ্গ—কতকগুলো মুখ্য, কতক-গুলো গৌণ। কাজটা হয়ত কর্‌তে গেলে কোনো কোনো অনুষ্ঠান তিন তিন বার ক'রে কর্‌তে হয়, হয়ত পাঁচ পাঁচ, হয়ত সাত সাত। এদের সব আলাদা আলাদা অপূর্ব আছে। সমগ্র কাজটা থেকে যে অপূর্ব জন্মাল (resultant potency to produce effect), সেইটে ফলাপূর্ব। শক্তিকূট (Forces) নিয়ে যে গণিতশাস্ত্র, আসলে তারই হিসেব মত চল্‌তে হবে। গুরু প্রভাকর "নিয়োগ"এর কথা ব'লেছিলেন। সে কথা এখন থাক্।

অগ্নিষ্টোম যাগ কর, সোমযাগ কর—এই রকমের উৎপত্তিবিধি আছে ; আর সে সব কর্‌তে গেলে কি ভাবে কি কর্‌তে হবে, তার বিনিয়োগ বিধি আছে। কোনো কিছু কর্‌তে যেটি বলে, তাহা বিধি ; কর্‌তে বারণ কর্‌লে প্রতিষেধ। এমনও হ'তে পারে যে—কিছু কর্‌তেও বলা হ'ল, আবার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কর্‌তে বারণও করা হ'ল। যেমন, ব্রহ্মচারীকে বলা হ'ল—শপথ কর তুমি দিনে ঘুমুবে না। যাগ, হোম, দান—কর্ম। সাধারণতঃ দেবতোদ্দেশে কিছু বলি বা ত্যাগ করাই যাগ ; অগ্নি বা জলে আহুতি হোম। প্রকৃতি যাগ, বিকৃতি যাগ, প্রকৃতি-বিকৃতি যাগ, আর প্রকৃতিও না বিকৃতিও না এমন যাগ আছে। উদাহরণ দিলাম না। নিত্য, নৈমিত্তিক আর কাম্য—এ ভাবে কর্মের ভাগ আছে। নিত্য নৈমিত্তিক কর্‌তেই হবে ; কাম্য ইচ্ছে হ'লে কর্‌তে পার। ফল সব্বাইকারই আছে। পুরুষের জন্য যে কাজ, সেটা পুরুষার্থ, আর

ক্রতু বা যজ্ঞের নিমিত্ত যাহা সেটাকে ক্রত্বর্থ বলা হয়। অবশ্য পুরুষ বা যিনি কৃতী, তাঁর জন্যই সব। কাজেই, সেই প্রয়োজনই মুখ্য প্রয়োজন। তবে তাঁর প্রয়োজন ত' আছেই; তা ছাড়া ক্রতুটার জন্যে কি কি আবশ্যক—এ ভাবেও দেখা যেতে পারে। দেখা হ'য়েও থাকে। কর্মের কোন্‌টা প্রধান, কোন্‌টা বা গৌণ—তা নিরূপণের জন্যে মীমাংসাদর্শন তৃতীয় অধ্যায়ে কতকগুলো দরকারী সূত্র দিয়েছেন। যাহা প্রধানের উপকারক বা "পরার্থ" তাকে "শেষ" বলে। এই তার্ত্তীয়শেষত্ব (তৃতীয়াধ্যায়ে উক্ত শেষত্বরূপ অঙ্গত্ব) বুঝ্‌তে শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, ক্রম এবং সমাখ্যা (বা নাম)—এই ছয়টী ভেবে দেখ্‌তে হয়। শ্রুতি যদি স্পষ্টই কোনটাকে "শেষ" নির্দেশ করেন ত' কথাই নেই। অভাবে, কোন চিহ্ন বা লিঙ্গ দেখে অনুমান হ'তেও পারে। বাক্যের গঠন, প্রকরণ (context), ক্রম (order), সমাখ্যা (শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় যোগে কোন এক অর্থ প্রতিপাদন করা—যেমন, আধ্বর্যবং হৌত্রং—এখানে, "আধ্বর্যব" পদের ব্যুৎপত্তি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, অধ্বর্যুকে কি কর্‌তে হবে) —এ সব দিয়েও কোন্‌টা "শেষ" বা পরার্থ তা ঠিক ক'রে নেয়া যায়। বেদমন্ত্র সমূহেরও বিচার বিশ্লেষণে একবাক্যতা, বাক্যভেদ, অনুষঙ্গ (কোন বাক্যাংশকে আর তার অর্থটাকে আবশ্যকমত টেনে নেয়া, বিস্তার করা, অন্যত্র যোজনা করা)—এই সব সূত্র ধ'রে চল্‌তে হয়।

এ সব ছাড়া অধিকারবিধি—স্ত্রীলোকের, শূদ্রের বৈদিক কর্মে অধিকার আছে কি না, ইত্যাদি—মীমাংসায় আলোচিত হ'য়েছে। বেদ মুখ্য প্রমাণ হ'লেও স্মৃতি, পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতিরও কতটা কি ভাবে প্রামাণ্য আছে না আছে, এসব নিয়েও আলোচনার অভাব নেই। বেদাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য নিরূপণে মীমাংসার দেওয়া সূত্রগুলো আবশ্যক ও মুল্যবান সন্দেহ নেই। আর, সত্য সত্যই যজ্ঞাদি কর্মের যদি সত্য প্রয়োজন থাকে (আছে কিনা তা পরীক্ষা-সাপেক্ষ—বিজ্ঞানের মতন) তবে, মীমাংসার এই বিশাল, বিপুল

প্রয়াসেরও সার্থকতা স্বীকার কর্তেই হবে। মীমাংসাদর্শনখানা তাই মণ্ডনমিশ্রের একখানা প্রসিদ্ধ পুঁথির নামে বল্‌তে গেলে—"বিধিবিবেক"।

কর্মমীমাংসা, কাজেই কর্মের দিক্‌টাই—কর্মের বিধিসংক্রান্ত কথাগুলিই—এ দর্শনে সবিশেষ আলোচিত হ'য়েছে। আমরা দর্শন বল্‌তে আগে যেটা বুঝেছি, সেটা, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জৈমিনিসূত্রে খুব অল্পই আছে। কিন্তু সে সূত্রের ওপর যে বৃত্তি (প্রাচীন বৃত্তিকার ভগবান্ উপবর্ষ ?), যে ভাষ্য (শবর স্বামীর) এবং যে সব বার্তিক-টীকা প্রভৃতি তৈরি হ'য়েছে, সে সবে দার্শনিক তত্ত্বসমূহের আলোচনা রীতিমতই আছে। প্রধানতঃ শবর স্বামীর ভাষ্য অবলম্বন ক'রে প্রভাকরের (যিনি বৃহতী লেখেন) আর কুমারিলের (যিনি শ্লোকবার্তিক, তন্ত্রবার্তিক, ইত্যাদি লেখেন) সম্প্রদায় সৃষ্টি হ'য়েছে। প্রভাকরের মতকে গুরুমত, আর কুমারিলের মতকে ভট্টমতও বলা হয়। কুমারিলের সিদ্ধান্ত তাঁর শ্লোকবার্তিক ইত্যাদি লেখা হ'তেই জান্‌তে পারা যায়; প্রভাকরের মত প্রধানতঃ তাঁর শিষ্য শালিকনাথের ঋজুমালা, প্রকরণপঞ্চিকা, এবং এই ধরণের আর আর পুঁথি থেকে জান্‌তে পারা যায়। কুমারিলের বার্তিকের ওপর পার্থসারথি, সুচরিতমিশ্র, সোমেশ্বর প্রভৃতি টীকা করেন। এ সব ছাড়া, সংগ্রহগ্রন্থ ও প্রকরণগ্রন্থ যে পরে কত লেখা হয়েছে, তার ঠিকানা নেই। নব্যন্যায়ের সঙ্গে শব্দের নিত্যতা, ঈশ্বরাস্তিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে কাটাকাটি করার জন্যে নব্যমীমাংসক সম্প্রদায়ও দেখা দিয়েছিলেন।

মূল বিষয়ে মিল থাক্‌লেও প্রভাকর ও কুমারিলের মতের অনেক বিষয়ে অমিল আছে। ধর প্রমাণের কথা। বৃত্তিকার আর কুমারিল ছয়টী প্রমাণ মানেন—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব (বা অনুপলব্ধি) এবং শব্দ। প্রভাকর অভাবটাকে আলাদা প্রমাণ ব'লে মানেন নি। "ভূতলে ঘট নাই"—এ স্থলে ভূতলটা প্রত্যক্ষ

দেখ্‌ছি ; আগে ঘটও প্রত্যক্ষ ক'রেছি। এখন আগেকার দেখা ঘট এখনকার দেখা ভূতলে নেই—এইটুকু বলা হ'ল মাত্র। এইরকম জেরা তুলে প্রভাকর অভাবটাকে আলাদা প্রমাণ মানেন নি। আমরা দেখেছি ন্যায় আর সাংখ্যও অভাব প্রমাণ মানেন নি। বেদান্ত নানা যুক্তি দেখিয়ে মেনেছেন। অর্থাপত্তি—যেমন, কোন জীবিত ব্যক্তি যদি বাড়ীতে না থাকে ত' নিশ্চয়ই বাইরে গেছে। দেবদত্তকে দিনে খেতে দেখি না ; অথচ শরীর তার হৃষ্টপুষ্ট ; কাজেই সে রাতে খায়। ইত্যাদি। এটাকেও একটা আলাদা প্রমাণ বল্‌তে ন্যায় ও সাংখ্য রাজি নন। এটা অনুমানের ভেতরেই পড়ে। নৈয়ায়িক কেবল-ব্যতিরেকির কোঠায় ফেল্‌বেন। মীমাংসক ব্যতিরেক দৃষ্টান্তবলে অনুমানে আস্থা স্থাপন করেন নি ; অথচ দৃষ্টান্তবলেই আসলে অনুমান হ'য়ে থাকে। বেদান্তপরিভাষা এক অন্বয়ি ছাড়া অন্যরকম অনুমান মানেন নি। ব্যতিরেকি অনুমান তাঁদের মতে অর্থাপত্তির ভেতর পড়ে। নৈয়ায়িক বল্‌বেন— অর্থাপত্তিই ব্যতিরেকির ভেতর। এসব নিয়ে খুব তর্ক চ'লেছে। উপমান (সেই গো আর গবয় এর দৃষ্টান্ত) মীমাংসকের অঙ্গীকৃত। নৈয়ায়িকেরও বটে। কিন্তু উপমানের ধরণটা মীমাংসার মতে অন্য রকম—"গ্রামে যে গরু দেখেছিলাম, সেটার মতন—সদৃশ একটা জন্তু এখন এই বনে দেখ্‌ছি।"—এইভাবে সাদৃশ্যের স্মরণ হ'য়ে হ'য়ে থাকে। গ্রামের গরুটা এখন সামনে নেই ; বনের পশুটা র'য়েছে। সেই অনুপস্থিত জন্তুটার সঙ্গে উপস্থিত জন্তুটার সাদৃশ্যের জ্ঞান হচ্ছে। এই রকমধারা সাদৃশ্যের জ্ঞানই উপমিতি। গবয় নামটা আমার জানা না থাক্‌তে পারে। কেউ হয়ত আমায় ব'লে দেয়নি, যে, বনে গরুর মতন দেখ্‌তে গবয় ব'লে জানোয়ার আছে। অর্থাৎ "গবয়" শব্দের যে বাচ্য কি, তাই জান্‌তে উপমিতি না হ'তে পারে। নৈয়ায়িক কিন্তু তাই ব'লেছিলেন। আগে দেখা কোনো জিনিসের সঙ্গে বর্তমানে দেখা (বা অন্য রকমে প্রত্যক্ষ) জিনিসের

সাদৃশ্যের জ্ঞান যাতে ক'রে হয়, তাই মীমাংসকের উপমিতি। প্রভাকর সাদৃশ্যটাকে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ (Category) বল্‌বেন; কুমারিল তাতে রাজি না। অর্থাপত্তি নিয়েও গুরুমত ও ভট্টমতে কিছু বিশেষ আছে। গোড়ায় সংশয় থাকে কি না থাকে—তাই নিয়ে তর্ক। যাক্ সে কথা। শব্দের—বেদের—প্রামাণ্য নিয়ে মীমাংসা খুব খেটেছেন। বেদোক্ত কর্মে (যাগাদিতে) প্রেরণা ও বিধি দেয় যে সব বাক্য, তাদের প্রামাণ্য প্রত্যক্ষ প্রভৃতি আর কোন উপায়ে স্থাপন করা যায় না। যাগ কর্‌লে যে স্বর্গলাভ হবার অপূর্ব হবে, তা আমি বিশ্বাস কর্‌ব কিসের জোরে? স্বর্গ পাইয়ে দেবার সামর্থ্যরূপ যে অপূর্ব, তা ত' প্রত্যক্ষ নয়; কাজেই, প্রত্যক্ষ আশ্রয় ক'রে যে অনুমানাদি হয়, তারাও অপূর্ব সম্বন্ধে আমার স্থির বিশ্বাস জন্মাতে পারে না। সুতরাং, বেদরূপ যে শব্দসমষ্টি বা বাক্যসমূহ, সেই ছাড়া আমার বিশ্বাসের এবং কর্ম-প্রেরণার অন্য ভিত্তি নাই। সাধারণ পুরুষের উচ্চারিত বাক্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে অবশ্য প্রমাণ হ'তে পারে; কিন্তু প্রভাকরের মতে, বাক্য ব'লে সেটা প্রমাণ নয়; সে লোককে হয়ত আমরা বিশ্বস্ত ব'লে মনে কর্‌ছি, তাই তার বাক্য প্রমাণ। বাক্য ব'লেই প্রমাণ শুধু বেদবাক্য; আর অতীন্দ্রিয় অপূর্বাদি বিষয়ে একমাত্র বেদবাক্যেরই প্রামাণ্য আছে। কুমারিল, সোজাসুজি, পৌরুষেয় আর অপৌরুষেয় এই দুই রকমেরই শব্দ প্রমাণ মেনেছেন। বেদ অপৌরুষেয়, কাজেই পুরুষের দোষগুণের দ্বারা তার প্রামাণ্যের হানি বৃদ্ধি নেই; তার প্রামাণ্য স্বতঃ এবং স্থির। বেদের ভেতরে বাজে কথা, বিরুদ্ধ কথা, লোকের নাম, ইতিহাস ইত্যাদি আছে, কাজেই বেদ নিত্য নয়, প্রমাণ নয় এই রকম সব আপত্তির উত্তর মীমাংসাসূত্র (১।১।২৪—২৭) দিয়েছেন। আমরা অন্য এক বইএ আলোচনা কর্‌ব।

শব্দের সঙ্গে তার অর্থের বা বাচ্যের সম্বন্ধও নিত্য। স্বাভাবিক (ঔৎপত্তিক) ব'লেই নিত্য। এই নামে এই বোঝাবে—এটা কেউ

ঠিক ক'রে দেয় নি। ঈশ্বরও না। রাম বা হরি বল্‌তে লোকবিশেষ বোঝাবে, এ দৃষ্টান্ত দিয়ে আর আর শব্দের ও অর্থের সম্পর্ক বুঝ্‌লে চল্‌বে না। শব্দ আর যে যে বর্ণ নিয়ে শব্দ তৈরি, তারাও নিত্য। মীমাংসা সূত্র (১।১।৬—২৩) বিচার ক'রেছেন। ন্যায় এবং বৌদ্ধেরা অবশ্য অনিত্য বলেন। শব্দ আর বর্ণ আছেই—তবে, অভিঘাত, প্রযত্ন, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ইত্যাদি অভিব্যঞ্জক থাক্‌লে তারা ব্যক্ত হয়। অন্যথা অব্যক্ত থেকে যায়। অব্যক্ত থাক্‌লে আমরা ভাবি, নেই। এ নিয়ে বিচার তোল্‌বার অবসর আমাদের এখন নেই। তারপর, মনে রাখ্‌তে হবে, বিধি দেবার জন্যেই শব্দ—মীমাংসা শব্দের অর্থের pragmatic view নিয়েছেন। "গরু আন"—বল্‌লে "গরু" কথাটার স্বতন্ত্রভাবে মানে আছে কিনা, তা নিয়ে প্রভাকর কুমারিলে মতভেদ আছে (অন্বিতাভিধান আর অভিহিতান্বয়—অন্বিত হ'য়ে তবে অভিধান—significance—হয় ; আর, যাদের নিজেদের অভিধান আছে, তারা বাক্যে অন্বিত হয়)। বৈয়াকরণদের "স্ফোট" এঁরা মানেন না। শব্দের বাচ্য জাতি, ব্যক্তি নয়। প্রাচীন ন্যায়ে জাতি, ব্যক্তি, আকৃতি তিনই।

অনুমান আর প্রত্যক্ষ নিয়েও মীমাংসা নিজের কিছু স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ'ড়ে তুলেছেন। আমরা সে সব কথা পাড়লাম না। জ্ঞান স্বতঃপ্রমাণ কিনা, তা নিয়েও নৈয়ায়িকের সঙ্গে তফাৎ আছে। জ্ঞান মাত্রেই জ্ঞান হিসাবে প্রমাণ ; প্রমাণ হওয়াই তার স্বভাব। সময় সময় যে ভুল হয়, তা দোষরূপ হেতু দ্বারা সেই জ্ঞানটার কারণ-সামগ্রী দুষ্ট হ'য়েছে ব'লে। এসব নিয়ে বিস্তর বিচার আছে। আমরা কথাটা পেড়ে রাখ্‌লাম মাত্র। জ্ঞান হ'লে সেটাকে জানি কি ক'রে—জ্ঞান স্বপ্রকাশ কিনা—এ নিয়েও অনেক কথা। প্রভাকর সংবিৎ বা চৈতন্যের স্বপ্রকাশ মানেন। কুমারিলের অন্যমত। ঘটটা দেখ্‌ছি। এখানে ঘট এই বাইরের বস্তুটাই প্রত্যক্ষের বিষয়, ঘটজ্ঞান বা ঘটবুদ্ধি নয় ;—অর্থটাই বিষয়, বুদ্ধি

(mental state বা representation) টা নয়। ঘট জিনিসের একটা মানসিক বৃত্তি (বা বুদ্ধি) যে আমার হচ্ছে, সেটা, মীমাংসার মতে, আমাকে অনুমান ক'রে জান্‌তে হয়। বাহ্য দ্রব্যটাকেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমি গ্রহণ করি বা বিষয় করি। আজকালকার Realistদের Presentative view of Perceptionএর সঙ্গে মেলে। ঘট সম্বন্ধে যে আমার একটা জ্ঞান হ'ল—এটা প্রমেয়, প্রমাণ ক'রে পেতে হয়। প্রভাকর ও কুমারিল একটুখানি আলাদা রকমে সে প্রমাণ (অনুমান) ক'রেছেন। ন্যায়ের সেই অনুব্যবসায় আর মানস প্রত্যক্ষের কথা মনে আছে ত'? ছ'খানি দর্শনের সব্বাই প্রত্যক্ষস্থলে presentative view নিয়েছেন। প্রভাকর এবং কুমারিল দুজনেই বৌদ্ধদর্শনের নিরালম্বনবাদ (বৃত্তিগুলোর কোনও স্বতন্ত্র অবলম্বন নেই), শূন্যবাদ প্রভৃতি বিশেষ যত্নের সঙ্গে খণ্ডন ক'রে জগতের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে চেয়েছেন। জগতের চরমতত্ত্ব শূন্য, অথবা জগৎটা কেবল ক্ষণস্থায়ী বিজ্ঞান-সন্তান (series of ideas) দিয়ে তৈরি—এটা তাঁরা খণ্ডন কর্‌তে চেয়েছেন। তাঁদের বিচার বিস্তৃত এবং খুব দরকারী। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সমবায়, সামান্য বা জাতি, সাদৃশ্য, শক্তি, সংখ্যা—এই পদার্থগুলি প্রভাকরের সম্মত। কুমারিল দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য আর অভাব পদার্থ মেনেছেন। এরা সব কয় রকম, এদের পরস্পর সম্বন্ধ ইত্যাদি এঁরা আলোচনা ক'রেছেন। বৈশেষিক দর্শনের সঙ্গে অনেকটা মেলে।

মীমাংসকেরা সাধারণতঃ যে ঈশ্বর মানেন না, তা আগেই ব'লেছি। কিন্তু দেহ হ'তে আলাদা আত্মা মানেন। আত্মা নিত্য, দেহভিন্ন, ইন্দ্রিয়াদি হ'তে ভিন্ন, জ্ঞানেচ্ছাদি হ'তেও ভিন্ন, কর্মের কর্তা এবং ভোক্তা। এ নিয়েও বৌদ্ধদের সঙ্গে খুব তর্ক। আত্মা বিভু। মাঝখানে মন (অণু ও ক্ষিপ্রগতি) র'য়েছে ব'লে, আমাদের জ্ঞানগুলো টুকরো টুক্‌রো আর পর পর হচ্ছে। মন আর ইন্দ্রিয়াদি করণ নিয়ে আত্মা বিষয়ের ভোক্তা। বিষয় বাহ্য, আন্তর। আত্মা

অনেক। জ্ঞান বা সংবিৎ স্বয়ংভাস্ব বা স্বপ্রকাশ, প্রভাকর বলেন। কিন্তু শাঙ্কর বেদান্তের মতন আত্মাই সংবিৎ বা চৈতন্য নয়। আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়। জ্ঞান হ'লে যেমন বিষয় বা জ্ঞেয় (ইদং) ফুটে ওঠে, তেমনি জ্ঞাতাও (অহং) ফুটে ওঠে। অর্থাৎ, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান তিনই (ত্রিপুটী) ফুটে ওঠে। কিন্তু জ্ঞানের অভাব হ'লেও আত্মা আছে। জ্ঞান আত্মার গুণমাত্র—নিত্য গুণ নয়। মুক্তিতে জ্ঞান থাকে না, অথচ আত্মা থাকে। সেই ন্যায়ের কথা। কুমারিলের মত একটুখানি আলাদা রকমের। কর্মজন্য অপূর্ব, তার ফলে নানান্ জন্ম সংসার। এতে সুখ থাক্লেও, এটা দুঃখবহুল। এ হ'তে মুক্তির ইচ্ছা হয়। নিষিদ্ধ কর্মত্যাগ, সকাম কর্মত্যাগ এবং আত্মজ্ঞান —এই তিন ধাপে উঠ্তে হয়। মুক্তিতে পাপপুণ্যের লেশ থাকে না; দেহও থাকে না। কিন্তু আবার, প্রভাকর মতে, জ্ঞানও থাকে না, আনন্দও থাকে না। কুমারিল মুক্তিতে যাবার ধাপগুলো প্রায় ঐ এক রকমেই দেখিয়েছেন। তবে, শেষকালে, আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যরূপে থেকে যায়, তাতে কোনও বিশেষ জ্ঞান বা সুখ-দুঃখ থাকে না। পরে অনেকে এ মত হ'তে এগিয়ে বেদান্তের আনন্দও এনে দিয়েছেন। বেদান্তের আলোচনায় এ সব কথা খোলসা ক'রে বল্তে চেষ্টা কর্ব।